



শারদীয়

প্রতীচী

The West

বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েসান অফ থ্রেটার আটলান্টা



‘প্রতীচীর এক যুগ’

হ্যাঁ, তাই বলছি তো, আমাদের শারদীয় প্রতীচীর এবার বার বছরের জন্মদিন। হিন্দু শাস্ত্রমতে বার বছরের একটা বিশেষ মানে আছে যে। আমাদের এক একটি যুগ হয় বার’র হিসেবে। সব যুগ পেরিয়ে এসে আমরা নাকি এখন কলিযুগে পৌঁছেছি। শোনা গেছে কলিযুগের আসল বয়স নাকি ঠিক করা হয় ‘দৈব বছর’ দিয়ে, আমাদের জানা ‘পার্শ্ব বছর’ দিয়ে নয় কিন্তু। প্রতি ‘দৈব বছরে’ রয়েছে বারটি ‘দৈব মাস’। আর বারশ ‘দৈব বছর’ হ’ল গিয়ে কলিযুগের জীবন। যা নাকি আসলে চারশ বত্রিশ হাজার ‘পার্শ্ব বছর’।

এ তো গেল হিন্দু মাইথোলজির গল্পো। আর আমাদের বারটি ‘পার্শ্ব বছরে’ আমাদের ভালবাসার ‘প্রতীচী’ এসে দাঁড়িয়েছে এক উন্নত মানের প্রকাশনায়। এবং আটলান্টার বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েসান (‘বাগা’) এর সব বাঙ্গালিদের এটা একটা অতি গর্বের বিষয়। বারটি বছর আগে প্রতীচীর যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি স্বপ্ন নিয়ে। অতি শীর্ণকায় সাদা-কালো কলেবরে ছিল তার পরিচয়। কিন্তু আজ তার ঝকঝকে রঙিন প্রকাশ বারে বারে মনে করিয়ে দেয়, যে তার স্বপ্ন সফল হয়েছে।

এবারের প্রতীচী তাই একটা বিশেষ সংখ্যা আমাদের সবার কাছে। এতে আমরা ভরে দিয়েছি পূর্বে প্রকাশিত মন টেনে রাখা কিছু গল্প ও কবিতা। অশাকরি এবারের সংখ্যা আপনাদের সবার মন জয় করবে। আর প্রতিবারের মত এবারের প্রচ্ছদেরও একটি বিশেষ মানে আছে। এটিতে ছাপ রেখে গেছে গত বার বছরের পদচিহ্ন। আর সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয়, আমরা আছি সেই কলিযুগে, সেই বারশ ‘দৈব বছরের’ কোনো একটি বছরে। মা আমাদের সেই পার্শ্ব আসুরিক শক্তির হাত থেকে রক্ষা করে চলেছেন অহরহ। কোনে দেখি অশার আলো, চলেছি আমরা, বারশ ‘দৈব বছরের’ আসছে শেষ, স্বর্ণযুগ তো ফিরে আসবেই আসবে॥

সঞ্জয় মাইতি

সম্পাদক



প্রতীচী

The West

বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশান অফ গ্রেটার আটলান্টা
(BAGA)
আয়োজিত

শারদীয় দুর্গাপূজা ২০০৯

আটলান্টা, জর্জিয়া

প্রতীচী

The West

✿ সম্পাদক
সঞ্জয় মাইতি

✿ সহ-সম্পাদক
অনিল চক্রবর্তী
শঙ্কর সেনগুপ্ত

✿ প্রচ্ছদ
সঞ্জয় মাইতি

✿ অক্ষর বিন্যাস
সঞ্জয় মাইতি
অনিল চক্রবর্তী
দেবশ্রী চ্যাটার্জী-ডন
শঙ্কর সেনগুপ্ত

✿ পরিকল্পনা ও রূপায়ন
সঞ্জয় মাইতি
মৈত্রেয়ী সরকার

✿ অন্যান্য সহায়তায়
দেবশ্রী চ্যাটার্জী-ডন

✿ Editor
Sanjoy Maity

✿ Co-editors:
Anil Chakrabarti
Shankar Sengupta

✿ Cover Design
Sanjoy Maity

✿ Typesetting
Sanjoy Maity
Anil Chakrabarti
Debasree Chatterjee-Dawn
Shankar Sengupta

✿ Planning & layout
Sanjoy Maity
Maitrayee Sarkar

✿ Other Assistance
Debasree Chatterjee-Dawn

দায়মোচন:

এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ও বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব ও মতামত সংশ্লিষ্ট রচনাকার এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের। তজ্জনিত কোনো ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকের দায়ী নন।

The views expressed in the writings that appear in this publication are the views of the respective authors and advertisers and not necessarily represent those of BAGA (Bengali Association of Greater Atlanta) committee or the publication's editor.

সূচিপত্র / Contents

President's Message



কবিতা

এই স্বপ্নের ঘোর * সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :: ৭
সিঁড়িতে কে বসে আছে * সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :: ৭
মায়ের মুখ * শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় :: ৭
ভাঙনের উত্তরপথে * সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :: ৮
তুমিও তো চাও হতে নদী * সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :: ৮
মানসী * অটলবিহারী বসু :: ৮
সম্পর্কঘটিত কথা * নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী :: ৯
নিউ ইয়র্কের এক ট্যাক্সি ড্রাইভার * নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী :: ৯
অমলকান্তি * নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী :: ৯
ধনি প্রতিধনি * মন্দাক্রান্তা সেন :: ১০
চাবুক * মন্দাক্রান্তা সেন :: ১০
রক্তকামিনী * মন্দাক্রান্তা সেন :: ১০
সতীকথন * মন্দাক্রান্তা সেন :: ১০
নদীমাতৃক * মন্দাক্রান্তা সেন :: ১০
কষি * মন্দাক্রান্তা সেন :: ১০
কবিগুরুর বিরহে * শিখা কর্মকার :: ১১
দুর্গার চিঠি * ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায় :: ১১
আবাহন * শুল্লা দেবশর্মা :: ১১
যাত্রী * দেবশ্রী চ্যাটার্জী-ডন :: ১২
ভাগ্যবতী মেয়ে * মঞ্জু বসু :: ১২
The Seeds of Our Heritage * Srimita Ray Chaudhuri :: 13
Where am I? * Pranam Dey :: 13
More War? * Susmita Gorai :: 13



গল্প / রচনা

আসা যাওয়া * শঙ্কর সেনগুপ্ত :: ১৪
বসুমতীর কেরামতি * নবনীতা দেব সেন :: ১৬
সরলাদেবীর 'কামিং টু অ্যামেরিকা' * রঞ্জিম সেন :: ২১
ক্ষুরস্য ধারা * বীথি চক্রবর্তী :: ২৫

সূচিপত্র / Contents

গৃহপ্রবেশ * সুচিত্রা ভট্টাচার্য :: ২৭
‘সে’ * সঞ্জয় মাইতি :: ৩১
চেনা... চেতনা * জয় ব্যানার্জী :: ৩৬
মুস্কিল আসান * পরাশর শর্মা :: ৩৭
ভৌতিক * সুব্রত মজুমদার :: ৩৯
মাষ্টার মশাই * মনোজিৎ ঘোষাল :: ৪১
গঙ্গারামের বৌ * শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় :: ৪২
GHOST TRAP * Roshni (Rosie)Chowdhury :: 44
The Mystery of ‘Himba Digamma’ * Tapan Das :: 45
How the Mermaid saved Mermaidville * Sristi Sengupta :: 46
My Trip to Nepal * Suryabrata Dutta :: 47

LIST OF ADVERTISERS

A to Z electronics	India Plaza	Patel Brothers & Swad
Advanced Dental Center	Kumar Pathak	Peoples Trust Bank
American United Bank	Malani Jewellers	Poona Resturant
Bengal Store & Halal Meat	Market Pharmacy	Print N Signs
Bhindi Jewellers	Meena Jewellers	Roof Depot
Café Bombay	Mirch Masala	Shalin Financial
Cherians	Mu Lau Chin Chin	Spalding Corners Travel
Ganesh indian Market	Nanston	
Gokul Sweets	One Georgia Bank	

PUJA SPONSORS

Sasthi and Saptami (Friday): Aditi & Priyabrata Dutta, Shanta & Kiriti Gupta, Saswati & Raja Banerjee, Suchandra Banerjee

Ashtami (Saturday) : Mira Bagchi, Shanta & Kiriti Gupta, Mala & Prodip Basu, Pratima & Tarun Shaw , Jayashree & Tapan Mukherjee, Aditya and Priyabrata Dutta, Pornika and Anil Chakrabarti

Nabami and Dasami (Sunday): Dharmojyoti Bhowmik , Sukla & Umasankar Mondal, Mala & Prodip Basu, Shanta & Kiriti Gupta, Joyita & Murli Hedge, Bobita & Ansu Moitra

President's Message

শ্রুতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রানের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে।
নীল আকাশের নীরব কথা শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা
বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে।
শস্যক্ষেতের সোনার গানে যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে দেখরে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যা রে।’

- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Dear BAGA Members & Patrons,

It is that time again! You would hear the rhythmic beatings of “Dhak” and chanting of “mantras”, the smell of “incense sticks”, the fragrance of “flowers and dhoono”. You would feel her greatness here at Atlanta, at BAGA’s courtyard, the presence of our beloved goddess - “Ma Durga”. Ma comes every year with her full family mounting on top of the Lion to kill the evil spirit “Mahishasura”. Her presence purifies our soul and strengthens our spirit.

On behalf of BAGA, I welcome you all to our annual Durga Puja festival and wish you that you get all the blessing from Ma Durga. Enjoy your festive events – the singing, dancing, gaiety and food! Remember, this is the time for “giving” as well. Please, make your dear ones “happy” and express your good wishes to others.

I view myself as your representative from BAGA community for this year and your voice. Therefore, please let us know, if we missed anything or need to improve on any aspect. As you all know, the year 2009 is particularly a very challenging year for BAGA from financial perspective. However, our executive committee has achieved several milestones this year starting with a great success of “Kabi Jayanti” held on 05/16/09. We saw the huge member turnout in our BAGA annual picnic - which was held at the scenic place of “Fort Yargo State Park” on 06/14/09. The onsite cooking with pleasant atmosphere was enjoyed by all participants. We have upgraded BAGA website with enhanced security and photo upload feature with “smugmug”. We secured a permanent home for all our annual Puja events at Shamrock by breaking many bureaucratic challenges.

I sincerely thank our senior BAGA members and directors for guiding and helping us in achieving all events with great success. I also appreciate our donors, sponsors and advertisers for their generous support for Durga Puja and past events. I acknowledge the effort and immense number of hours spent by many BAGA participants for our event organization.

As we turn towards the month of “Ashwin” & “Kartik”, the season of autumn, our Bengali hearts start dancing with joy and happiness. With the advent of Mahalaya, we invite mother goddess to descend on earth - “Jago Tumi Jago”. On September 12, we observed our solemn ceremony of “Mahalaya” as per our tradition - with Tarpon, Chandi-Path and Agomoni/Bodhon in presence of more than 150 participants. Now we are focused on celebrating our greatest festival of the year – BAGA’s 31st year of Shardotsav with full fervor, joy and happiness. All activities are in full swing! Our local talents are preparing to perform in various arts and cultural events. Teams are engaged in preparation of Puja decoration items. Food services are being finalized. Light and sound contract is under negotiation. Shoppers are getting ready to purchase various puja items. Teams are being formed to provide various BAGA services. We will need help from many of you during this great festival time. Your voluntary initiatives are most welcome and desired. Please come forward and enjoy your three day festive moments. We have also arranged two separate events of performances by two very popular singers from Kolkata/Mumbai (26th evening & 27th afternoon). I am confident that you would enjoy your whole time with us during Durga Puja.

May the divine blessings of Ma Durga give you the strength to overcome all evils in your life!
Have a nice & memorable Durga Puja! ॐ

Priyabrata Dutta

BAGA COMMITTEE

Executive Committee

President:

Priyabrata Dutta

Vice President:

Debasree Chatterjee-Dawn
Saswati Banerjee

Secretary:

Joyita (Bagchi) Hegde

Treasurer:

Subhankar Mukherjee

Extending Committee

Cultural

Adity Dutta, Sudipta Das, Reshmi Mukherjee, Soumitra Chattopadhyaya (advisor), Malabika (Nita) Bose (advisor)

Food

Mala Basu, Pratina Sau, Chaitali Chatterjee, Madhumita Sinha Roy

Decoration

Indrajit Chowdhury, Gayatri Dey, Sonjukta Halder, Kumkum Dalapati, Ananda Rakhit

Website

Kakoli Bose, Santanu Bose

Pratichi Magazine & eBAGazine

Sanjoy Maity, Shankar Sengupta, Raktim Sen, Soumitra Chatterjee, Sajal Chatterjee

Youth Committee

Ria Rakhit

Priests

Partha Mukherjee (Sr.), Satyam Chakrabarti, Soumitra Chattopadhyaya, Sailendra Banerjee, Anil Chakrabarti

Puja Preparation

Shanta Gupta, Sabita Bose, Uma Mukherjee, Chandra Mukherjee, Swati Chowdhury, Kumkum Chakrabarti, Parnika Chakrabarti

Fund Raising

Kiriti Gupta, Achintya Dey, Mamata Paul, Anil Chakrabarti, Partha Mukherjee (Jr.), Santanu Sinharoy, Shanta Gupta, Arunabha Saha, Premananda Goswami, Debatirtha Basu, Mallika Basu, Umasankar Mandal, Dibyendu Dey, Rabindra Chakraborty, Nita Bose, Moitri Sarker, Sukla Mandal, Sanghamitra Saha, Anupa Guha Thakurta, Subroto Majumdar

Light & Sound

Abir Guhathakurata, Ashoke Sarker

Photography

Debasis Dawn, Murli Hedge

Public Relations & Hospitality

Kasturi Talukdar, Nita Bose, Ashima Das, Srimita Ray Chaudhuri, Shanta Gupta, Kabita Roy, Mamata Paul, Soma De, Sabari Roy, Subhra Nag, Kalyani Kar, Rita Das, Alpina Podder, Durba Chatterjee, Munmun Sen, Anjali Roy, Ruma Mukherjee, Maya Biswas

Volunteers

Mridul Paul, Kalyan Mitra, Sujit Bose, Amiya Ray Chaudhuri, Bibhu Das, Ruma Sengupta, Aparna Bhowmick, Papiya Dutta, Saswati Mukherjee, Joyita Deb, RajaGoutam Kar, Surajit Roy, Sujit Bhowmik, Parul Deka, Ranjita Betarbet, Avro Deb, Krishnendu Das, Satindra Podder, Debasis Dalapati, Sanhita Majumdar

Board of Directors

Chairperson: Srimita Ray

Members:

Anil Chakrabarti
Dibyendu De
Shanta Gupta
Umasankar Mondal
Prem Goswami
Robi Basu

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

এই স্বপ্নের ঘোর

দশটা সতেরো, দরজা বন্ধ, হাওয়ায় ভাই ফুলের গন্ধ
দশটা আঠেরো, দরজা বন্ধ, অকস্মাৎ রেডিও স্তব্ধ
দশটা উনিশ, ড্যাম্ ইট, ফুল, জানলাটা দিয়ে তাকাও বাইরে
জানলা, জানলা, ইন্টারনেট, টোয়েন্টি ফাস্ট, জানলা জানলা
দশটা একুশ, ইঁদুরের দৌড়, বাজারে আগুন, ফ্লাইট ক্যানসেল্ড
দশটা বাইশ, ল্যান্ড টেলিফোন, ডেন্ট মুভ, ওটা মেসেজে থাকবে
দশটা পঁচিশ, জীসাস্! মীটিং, অন্ততঃ সোওয়া ঘন্টার ড্রাইভ।

এই পৃথিবীতে কোন ঘড়ি নেই, স্টিফেন্ হকিং, সময় স্তব্ধ
এই পৃথিবীতে সব ঘড়ি শেষ, সময় সসীম, নাও গেট লস্ট!
ফের বিগ ব্যাং! কী বিরাট জ্যাম, নিউ জার্সি টার্নপাইকে হাঃ হাঃ
আমি তো কোথাও যাচ্ছি না, আমি জন্ম নিইনি, নিছক একটা স্বপ্ন হয়ত
টোয়েন্টি ফাস্ট সেঞ্চুরি, এই স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়ে দিও না
এই মুহূর্তে এক্স-ওয়াই নামে ক্রোমোজোম ছুটে যাচ্ছে আমার নারীর গর্ভে
ওদের থামিয়ে দিও না, প্লীজ, মানুষ না থাক, স্বপ্ন বাঁচুক!

সিঁড়িতে কে বসে আছে

সিঁড়িতে কে বসে আছে মুখ ঢেকে একা?
এত অন্ধকারে এক জীবনের সারাংশের দেখা।

সিঁড়িতে কে মুখ ঢেকে একা বসে আছে?
চিনতে পারো নি; যাও, চুম্বনের ছলে ওর কাছে।

মুখ ঢেকে একা বসে আছে কে সিঁড়িতে?
সমস্ত হারিয়ে যাওয়া এসেছে ফিরিয়ে নিতে!

সিঁড়িতে কে বসে আছে একা ঢেকে মুখ?
ওর কি অতীত ছাড়া নেই কোনো বিশ্বস্ত সম্মুখ!

সিঁড়িতে কে আছে মুখ ঢেকে একা বসে?
যে চুম্বনে শেষ নেই, তাও গেছে বৃত্ত থেকে খসে!

সিঁড়িতে কে বসে আছে একা মুখ ঢেকে?
দণ্ড পল থেমে আছে, অন্তরীক্ষ দেখছে দূর থেকে!

মায়ের মুখ

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গা পুজার, আর কটা দিন বাকি,
দূর বাতাসে 'আগমনী'র গান।
ঢাক-কাঁধে, ঐ ঘুরছে ক'জন ঢাকী;
রতন কুমোর, দিচ্ছে তুলির টান।

হাঙ্কা-হাতে; টানছে রঙের তুলি
দুর্গা মায়ের, আঁকছে চোখের তারা -
নিখুঁতটানে, আঁকছে ভুরুগুলি।
ব্যস্ত এখন, সারা কুমোর পাড়া।

এমন দিনে, সকাল থেকে দুপুর, -
বুকের মধ্যে, কিসের যেন সাড়া।
পড়া-শোনায় মন বসেনি পুপুর,
সাত-সকালেই হাজির, -কুমোর পাড়া-য়া।

তুলীর আঁকা দুচোখে - চোখ রেখে,
ভাবছে, - সে মুখ কেমন যেন চেনা।
দেখতে দেখতে, কেবল, থেকে থেকে-
মনে পড়েও, ঠিক যেন পড়ছে না।

রতন কুমোর, আজকে, তুলির টানে
আঁকলো যে মুখ, সে ঠিক যেন কার?
অবাক চোখে, চেয়ে, তারই পানে, -
বুঝলো পুপু, - তা যে, নিজের মা-র।

সামনে দেখে, মুখটা এখন চিনে, -
ছুটলো পুপু, - সোজাই নিজের বাড়ি।
ভীষন খুশি, আজ সে, এমন দিনে, -
মা-কে খবর দেবেই, তাড়াতাড়ি।

ছুটছে, বুকে ঢাকের শব্দ নিয়ে, -
মাটিতে, আর পা-ই যেন পড়ছে না।
বাড়িতে, সে খবর দেবে, গিয়ে, -
দুর্গা ঠাকুর, আসলে, - তার মা॥

সৌমিত্র চট্টপাধ্যায়ের দুটি কবিতা

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

ভাঙনের উত্তরপথে

ভাঙনের উত্তরপথে
গড়বার আহ্বান থাকে
এই কথাটুকু এইবার
পাঠাব যে তাকে।

ঘর থাকলে ঘর ভাঙে
নদী থাকলে ভাঙে তার পাড়
এ কথাই অস্ত্র হ'ক
এই যুদ্ধে বর্ম হ'ক তার।

মানুষের মত হবে
তাই জনশ্রোতে ভেসে ভেসে
দ্যাখে জল চলে যাচ্ছে
কখন অক্লেশে।

তবু সব যায় না তো
অকাতর আছে যুদ্ধভূমি-
এই প্রশ্ন পাঠাই যে তাকে
পলাতক না কি সৈনিক তুমি?

অস্ত্র নিলে যুদ্ধ দিলে
তবেই তো ঋতুচক্রে মেঘ
তবে এই জন্মে অধিকার
আত্মজন সুখস্মৃতি প্রীতির আবেগ।

হেরো না কিশোর তুমি
হ'ক না এ পথ যত ভাঙা
গড়ার বেদনা আর সুখে
দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া ফুল রাঙা।

তুমিও তো চাও হতে নদী

বড় জোরে ছুটেছে এ পৃথিবী
তুমি কি পারবে যেতে সঙ্গে?
বড় দ্রুত বয়ে যায় নদী
তুমি পার যেতে সে তরঙ্গে?

যেতে যেতে মেতে ওঠে হাওয়া
নৌকো ভেসে থাকে কি না থাকে!
আকাশেও বিদ্যুৎরেখা
ফিরে যেতে বলে যদি তোমাকে?

নদী ফেরে না তো তার উৎসে
তুমিও তো হতে চাও নদী
জনপদ মাঠ বনরাজি
শেষ হলে গার্হস্থ্য-জলধি!

বড় দ্রুত বদলে যায় সব
জলছবিগুলো ভেঙেছে কখন
নদীতট স্থর তবু নিশিদিন
যতই বদলে যাক বন্ধু-পরিজন।

তুমিও তো শ্রোত চির বহমান
প্রেম কি অপ্রেম পড়ে থাকে নদীতটে
বড় দ্রুত ছুটেছে এ পৃথিবী -
তুমি কি পারবে যেতে সিন্ধুর নিকটে?

মানসী

অটলবিহারী বসু

বজ্রবজ্র, পশ্চিমবঙ্গ

আমার জীবনে তোমার আগমন
সে যে বড় বিশ্বাস
তবু তো এমনি হয়।

দিনে দিনে নিত্য নূতনে
নব নব ভাব বিনিময়ে
অন্তরে কে যে কথা কয়
তবু তো এমনি হয়।

প্রশান্তির গভীরতায়
অমূর্তে যে তুমি
আমার জীবন দীপে জ্বলেছে আলো
কত রূপে রসে মমতায় মাধুর্য্যে।

এই ধরণীর আনন্দলোকে
অনন্ত বিস্তার মুর্ছনায়
ভরে তুলেছে ছবি হৃদয়।
অমৃতময় মাধবের দিব্য ইচ্ছায়
দিকদিগন্ত আলোয় আলোকিত
বিশ্ব আনন্দধারায় প্লাবিত
অমূর্ত যে মূর্ত লভে
সে তুমি আমার মানসী
আমার কল্পনা।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তিনটি কবিতা

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

সম্পর্কঘটিত কথা

কীভাবে সম্পর্ক হয়, কার সঙ্গে হয়, কেন হয়,
কীভাবে মানুষ
নিজের বৃত্তের থেকে হাত বাড়িয়ে দেয়
বৃত্তটির বাইরে, সে কীভাবে
তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ও নানাবিধ পরিকল্পনার
প্রতিবিশ্ব দেখতে পায় অন্য একজন
মানুষের চোখে,
দেখতে দেখতে তার সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণ করে,
আর কীভাবে সম্পর্কগুলি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে
দুই-দশ কদম হেঁটে যায়, অথবা সটান
হাঁটতে থাকে মাইল-মাইল,
তারপর একদিন
তাতেও ঘুণ ধরে,
এইসব দেখতে দেখতে এখন আমার
হাড়ে দুধো গজিয়ে গিয়েছে।

কথাটা বললেন যিনি, ভাবছি বেছে-বেছে
একগাদা লোকের মধ্যে আর কাউকে না বলে
তিনি কেন আমাকে বললেন।
সে কি এইজন্যে যে আমার
যদিও সম্পর্ক হয় নিত্য নব-নব, তবু তার
একটাও টেকে না,
দুটো-চারটে ধোপ পড়লে অমনি ফেঁসে যায়?
কথাটা মিথ্যেও নয়, তবু নিত্য হাত বাড়িয়ে রাখি
নতুন বন্ধুর প্রতীক্ষায়।

নিউ ইয়র্কের এক ট্যাক্সি ড্রাইভার

ম্যানহাটন সেন্টারের সামনে থেকে
হোটেলটা আমাদের পৌঁছে দেওয়ার পরে
অনেক জোরাজুরি করা সত্ত্বেও
কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ ড্রাইভারটি যে কিছুতেই
আমাদের কাছ থেকে
ট্যাক্সিভাড়া নিলেন না, আমি

যতবার তাঁর দিকে
ভাড়াটা এগিয়ে ধরলুম, তিনি ততবারই
সলজ্জ হেসে পিছিয়ে গেলেন,
তার কারণ আর কিছুই নয়, তিনিও একেবারে
নির্ভেজাল একজন বাঙালি। তা
বাংলাদেশের ধামরাইলের (‘ঐ যেখানে মস্তমইনা
রথের মেলা অয়’) বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তিনি
নিউ ইয়র্কে ট্যাক্সি চালাচ্ছেন, কেননা
‘আন্ডাবাচ্চা’গুলারে তো খাওয়াইয়া-পরাইয়া
বাঁচাইয়া রাহন লাগব! দাদা, আপনে কী কন,
লাগব না’?
শুনে আমি আর কী বলব, ঢোঁক গিলে বললুম,
‘বটেই তো, বটেই তো’!

বললুম বটে, কিন্তু সেই থেকে একটা অস্বস্তির
কাঁটা আমার বুকের মধ্যে খচখচ করছে।
ভাবছি যে, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই যে
সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার
সে তো ষোল-আনার ওপরে আঠারো-আনা ঠিক;
আবার এটাও কিছুমাত্র
বেঠিক ব্যাপার নয় যে যাত্রীদের স্বেচ্ছা বাংলায়
কথা বলতে শুনে আত্মহারা আনন্দে যিনি
ট্যাক্সি ভাড়াটাও ফিরিয়ে দেন, তাঁর
‘আন্ডাবাচ্চা’-রা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকলেও হয়ত
ভবিষ্যতে আর
বাংলা ভাষায় কথা বলবে না

কিন্তু তার চেয়েও ঠিক কথাটা এই যে,
আমাদের হোটেলের সামনে থেকে
এইমাত্র যিনি আর-একজন
যাত্রী তুলে নিলেন,
তা নিয়ে অন্তত এখন তিনি ভাবছেন না।
তিনি এখন ধামরাইলের
‘মস্তমইনা’ রথের মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অমলকান্তি

অমলকান্তি আমার বন্ধু ...
ইস্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।
রোজ দেরি করে সে ক্লাসে আসত,
পড়া পারত না,
শব্দরূপ জিজ্ঞেস করলে
এমন অবাক হয়ে
জনলার দিকে তাকিয়ে থাকত যে,
দেখে ভারী কষ্ট হত আমাদের।

আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম,
কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি সে সব কিছু হতে চায়নি।
সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।
ক্ষ্যান্তবর্ষণ কাকডাকা বিকেলের
সেই লাজুক রোদ্দুর,
জাম আর জামফলের পাতায়
যা নাকি অল্প একটু হাসির মত লেগে থাকে।

আমরা কেউ মাস্টার হয়েছি,
কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে।
মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে,
চা খায়, এটা-ওটা গল্প করে,
তারপরে বলে, ‘উঠি তাহলে’।
আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমাদের মধ্যে এখন যে মাস্টারি করে,
অনায়াসে সে ডাক্তার হতে পারত,
যে ডাক্তার হতে চেয়েছিল,
উকিল হলে তার এমন কিছু ক্ষতি হত না।
অথচ সকলেরই ইচ্ছাপূরণ হল,
এক অমলকান্তি ছাড়া।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
সেই অমলকান্তি,
রোদ্দুরের কথা ভাবতে ভাবতে
যে একদিন রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।

একগুচ্ছ কবিতা

মন্দাক্রান্তা সেন

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

ধনি প্রতিধনি

যখন নিজের হাতে যত্ন করে খুলি
আমার মাথার ধনরত্নে ভরা খুলি

খুলতে না খুলতেই দেখি ভেদ করে চাঁদি
আস্তে আস্তে উঠে আসছে আস্ত একটা চাঁদই!

অতঃপর সূর্য্য, আরও কোটি কোটি তারা
আমাকে আশ্চর্য্য দেখে, হেসে বলল তারা -

আমরা তো হারিয়ে যাব মহাশূণ্যে, নীলে,
তার আগে বলো তুমি কাকে কাকে নিলে!

কাকে রাখব ভাবি আমি, কাকে ফেলব ভাবি
আমার মগজে ধন! আমি তো অভাবি!

চাবুক

আহা, তার কী রাগ কী রাগ
সে জ্বালে আমার চিতা, আমি সেই চিতা থেকে
জ্বেলে নিই চিরাগ, চিরাগ।

লোকে আজ যা ভাবে ভাবুক,
শিরদাঁড়া-বরাবর আমি তো নিয়েছি ঐকে
আরও একটি চাবুক, চাবুক।

তবে মাঝে মধ্যে এও ভাবি -
হয়ত কোনওদিন এই চাবুকেরই রেখা বেঁকে
খুঁজে নেবে অন্য কোনও চাবি ...

রক্তকামিনী

মুখে রক্ত বুকে রক্ত, রক্ত তার দু পায়ের ফাঁকে
রক্তের আদিম গন্ধে সে আকুল করেছে আমাকে

রক্তের আমিষ গন্ধে আকাঙ্ক্ষাও তিলে তিলে রাঙা
সাধের অকূল গাঙ, মধ্যখানে তিনকোণা ডাঙা

কে কাকে পুরুষ বলে, কে বা কাকে বলতে পারে নারী
অন্ধকারে যাকে পাই, সে আলো তো আমার,
আমারই...

সতীকথন

কেন যে এমন হয়, ভাবি!
ভুলে গেছি পুরুষের বিকট নগ্নতা, শুধু
মনে আছে রমণীর নাভি।

প্রথমতঃ, মনে আছে তার প্রতি প্রথম সন্দেহ।
দ্বিতীয়তঃ, ঈর্ষা, আহা, তার সেই নমনীয় দেহ!

সে আমার চেয়ে ঢের রূপসী যে, আমিও শুনতাম।
গোপনে দেখেছি তাকে - তাদের, সঙ্গমরত।
আমারও মাথার মধ্যে কাম

বলসে ওঠে, বলসে ওঠে। না, পুরুষ নয়, তারই প্রতি।
(সে হিসেবে আমি তবে পরপুরুষকামী নই, সতী!)

স্বপ্নে একটু একটু করে, ক্রমাগত ভুলে গেছি মুখ,
তবু মাঝেমাঝে, আজও, চোখে ভেসে ওঠে সেই
স্বপ্নিত, স্বেত, গোলাকৃতি বুক ...

প্রসঙ্গতঃ, তার পাশে উলঙ্গ পুরুষরত্ন - ইনি
আমার প্রথম স্বামী। রমণীটি - তাঁর প্রণয়িনী।

নদীমাতৃক

আবারও সকালে নেমেছি জলের ধারে
অশরীর যত ধূলো জমা হতে পারে
জলে গুলে, মেখে, গড়েছি কাদার তাল
পাশে পড়ে ছিল যত পাতাকুটো, জঞ্জাল -
জ্বেলেছি আগুন, পুড়িয়েছি সেই কাদা
যেভাবে জীবন জলে ও জ্বলনে বাঁধা
তেমনই বেঁধেছি অশরীরী প্রতিমাটি
শুধু একদলা রক্তাভ পোড়ামাটি
আদল বিহীন ... তবু চেনা চেনা লাগে
আঙুল রেখেছি পুড়ে ফেটে যাওয়া দাগে
আঁকাবাঁকা খাত, শুকনো - এ খাতে যদি
না-ই বয়েছিল আমারই আকুল নদী
অশরীর এত শিরা তবে কার বোনা?

বলো - পারছি না। বলো, বলো - পারব না...

কষি

সবে তো তখন কোমরের কষি আলগা
বাবুরা হঠাৎ চোঁচিয়ে ওঠেন - ভালগার!

আহা, এরই মাঝে ভালগারিটির পেলের কী?
ভাল লাগল না ঘাড়বাঁকা মেয়েছেলে কি?

বাঁকা ঘাড়, তবে বাকি সব সোজাসাপ্টা
কোমরের নিচে তারও পাখি ডানা ঝাপটায়

মনে আছে, বাবু, আপনারা ভালবাসতেন
পাখির ডানায় উড়াল গন্ধ - আঁশটে -

অ্যাদূর শুনে বিবির বালেন - আঃ, ছিঃ!
কোমরের কষি ভাল করে তাই আঁটছি।

কবিগুরুর বিরহে শিখা কর্মকার

কেমন সহজে,
গাঢ় হল ঘাস,
আকাশ জুড়ে, জমল মেঘ;
তৃষ্ণার্ত বাংলা জুড়ে নামল,
রূপোলী বৃষ্টি।

কেমন সহজে,
ভাবনা হল কথা,
কথা হল কবিতা,
কবিতা হল গান,
গান হল নাচ;
বইল নাচের নদী ঝলমলিয়ে,
বইতে বইতে সে পৌঁছে গেল
দিগন্ত পারের স্নিগ্ধ ঈশ্বরের কাছে।

আজও, তোমার বিরহের তাপে,
কৈপে ওঠে দিন;
প্রিয়জনের মতো
টলটলে অনুভবে মন ভরিয়ে,
অজ্ঞাতে সরে গেলে।
আর তোমার জন্য কেউ কেউ,
আকাশের নীচে,
ভোরবেলার হাওয়ায় বসে,
হা হা কান্নায় ভরায় প্রান্তর!

তুমি হয়তো ভাবতেও পারবে না
আজও, এ মুহূর্তে
এত বছর পরেও,
নিখাদ সোনার মতো,
তোমার মায়া, গাঢ় ভালোবাসা,
বৃষ্টি হয়ে ঝরে
ভাসিয়ে দেয় মন।

তুমি হয়তো ভাবতেও পারবে না
আজও, এ মুহূর্তে
এত বছর পরেও,
আমরা অপেক্ষা করি
তোমার ফেরার পথে।

ভাবি, এই বুঝি কুয়াশা সরিয়ে
হেঁটে এলে,
মুখে শান্তিময় স্নিত হাসি।
বুকের ভাবনা কথা হয়ে যাচ্ছে

বাতাসে,
কথা কবিতা,
কবিতা গান,
গান নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে,
নদীর শেষে ফুটে উঠছে ঘাস।
ঘাসে ঘাসে, ঋতুতে ঋতুতে,
জনমে - মরণে, সুখে ও অসুখে
তোমার গানের বন্যা প্রাবিত করে
দিচ্ছে
শুকনো বাংলার তৃষ্ণার্ত বুক!

দুর্গার চিঠি ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়

দুটো চোখে গ্লকোমা, দেখতে নারি পষ্ট।
ত্রিনয়নটা আছে রক্ষা, কমছে কিছু কষ্ট।
শিবের কথা তুলো নাকো— বয়েস কালের দোষে
আজ ডিগ্‌ডিগে বুক, স্ফীত ভুঁড়ি—বাঘছাল যাই খসে।
ছেলেমেয়ে বড়ো হয়ে, ভাবনা গেছে বেড়ে
স্বাধীন হতে চাই যে সবাই বাবা মাকে ছেড়ে।
স্বরস্বতী পড়ায় ভালো— যাবে আমেরিকা,
বাড়ী গাড়ী নিয়ে নিবিড়— লক্ষ্মী বোকাসোকা।
পেটুক গনেশ কলাবৌকে করে দিয়েছে সাবাড়,
পরের মাসে কোটকাছারির দিন পরেছে আবার।
কার্তিককে জোর করে সব পাঠিয়েছে ইরাকে,
বেঁচেবর্তে ফিরলে যে হয়, জিগ্‌সেস করি কাকে?
হাঁস, প্যাঁচা আর ময়ূর ইদুর, প্রাণটা ঝালাপালা,
সকাল বিকেল খাবার জোগাও, হাজার'টা ঝামেলা।
এরই মাঝে লেগে আছে কাজের লোকের কামাই—
ইচ্ছে করে পেতাম যদি আমেরিকান জামাই।
মরা খেঁগো চেহারা নয়, শরীরে কি শক্তি!
পকেট ভর্তি ডলার আর মগজ ভরতি যুক্তি।
বিয়ে মানে দাসত্ব নয়, বিনে মাইনের চুক্তি,
আহা, কি সব ভালো কথা—শুনলে আসে ভক্তি।
নিজের কথাই লিখছি খালি, করবো কি ছাই বলো—
মা দুর্গা, মা দুর্গা বলে সব লোক যে ম'লো!
ঘরের হ্যাপায় মরছি জ্বলে, অস্থির মন মতি—
কেমন করে নাশ করি আজ পরের দুর্গতি!

আবাহন শুক্লা দেবশর্মা

মা এসেছে, মা এসেছে,
ওরে শঙ্খ বাজা উলু দে,
কে কোথায় আছিস,
বাজা কাঁসর বাজা ঘন্টা।
ষষ্ঠীতে যে মায়ের বোধন,
পৌছাবে বেলতলা,
সবাই মিলে বরণ করে,
বসাবো আটচালায়।
সপ্তমীতে সুপ্ত সুরে করব কলরব,
অষ্টমীতে ধুনটী নাচের উঠবে অন্যরব।
নবমীতে ঢাকের আওয়াজ,
ভরবে আকাশ বাতাস।
দশমীতে বিজয়া - আর ভীষণ মিষ্টি খাওয়া।

যাত্রী

দেবশ্রী চ্যাটার্জী-ডন

ওগো যাত্রী,
আমরা যে আজ এক পথেরই যাত্রী।

কত ঝড়-জল, সংঘাত-সংগ্রাম
অতিক্রম করে চলেছি যে পথ
দিন রাত্রি।

ক্ষুধার্ত শিশুর দিকে তাকিয়ে-
অসহায় মায়ের করুণ হাহাকার
“অন্ন নাই, অন্ন নাই, অন্ন চাই, অন্ন চাই,”
হে বিধাত্রী।

তরুণ যুবক যুবতীর কতৃপক্ষের প্রতি
সবিনয়ে নিবেদন,
“আমাকে যেতে দিও না, আমার চাকরী
চাই,
সংসারে আমিই যে আজ কত্রী।”

যুদ্ধ-বিদ্রোহ সৈনিকের ঘরে ফেরার
প্রতীক্ষায় প্রেমিকার
সকাতরে প্রার্থনা, “যুদ্ধ চাই না,
যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই, প্রেম ও
ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধো
এই ধরিত্রী।”

ধীরে ধীরে থেমে এসেছে ঐ
কালবৈশাখী,
সমাজবাদীদের প্রচেষ্টায় শিশুরা
আজ যে দেশের সম্পদ,
নবযুগের সুধৃতি।

পিতামাতার নিরলস হাড়ভাঙ্গা
প্রিশ্রমে রক্ষা ভূমি আজ
যেন সবুজেরই প্রতিমূর্তি।

তরুণ তরুণীর রাতজাগা সংলাপে,
অনলস কর্মযজ্ঞে আজ যেন
সব কষ্টের নিবৃত্তি।

তারপর শুরু হ'ল যুদ্ধ শেষের ঘোষণা,
সৈনিকের আজ ঘরে ফেরার পালা-
তারই আনন্দ উচ্ছ্বাসে উচ্ছলিত
যেন আমাদের এই ধরিত্রী।

ভাগ্যবতী মেয়ে

মঞ্জু বসু
চার্লস্টন, ইলিনয়

ভাগ্যবতী মেয়ে আমি দুজন আমার মা,
সারাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে তাঁদের গরিমা।
একজন সে জন্ম দিয়ে করল খানিক লালন,
অন্যজন সে পরে আমায় যত্নে করে পালন।
দু'জনকেই ভালবেসে থাকি আমি বেশ,
দু'জনেরই কাছে আমার নেই যে ঋণের শেষ।
মায়েরা মোর সারাজীবন দিয়েই তবু যায়,
তাঁদের তরেও দিতে কিছু প্রাণ যে আমার চায়।
ছোট ছিলাম যখন এসব জাগেনি ত মনে,
বড় হ'য়ে সে ভাবনা ফেরে সঙ্গোপনে।
যখন শুধাই “মায়েরা মোর বলনাগো মোরে,
এত পেয়ে একটু আমি দেব কেমন করে?”
মিষ্টি হেসে বলেন তাঁরা, “আদুরে সন্তান,
দুঃখ মোদের দিসনে কভু করে অসম্মান।
একজনকে গরীব ভেবে অন্যজনকে ধনী,
পার্থক্য করিস যদি, তায় অপমান গনি।
আবার যদি ধনী মাকেও ছোট করিস তুই,
অসম্মান করা হ'বে বলিরে নিতুই।
বুদ্ধি দিয়ে কর্তব্য করিস মেয়ে হ'য়ে,
ন'ইলে তোকে শিক্ষা দেওয়া যাবে বৃথা বয়ে।
আমাদেরও কর্তব্য, মা হ'য়ে থাকা,
আমরা যে ভারত আর উত্তর আমেরিকা।

The Seeds of Our Heritage

Srimita Ray Chaudhuri

We come together as friends
seeking unity among culture
and striving to preserve our heritage.
Our attributes and achievements
are embedded in the legacy
we pass on to our children.
That is why it is important for us,
Bengalis to give homage to our birthplace
by keeping our aged old traditions alive.
Our community is just a seed in the ground,
waiting to sprout up into a big gigantic tree.
Our efforts represent the nourishment
The seed needs in order to sprout up above the ground.
Our wisdom will act as roots
That will anchor our tree.
Our kinship will shape the stalk,
Thus preserving our precious customs.
Our children will be the tree's branches,
Branching out into new horizons.
One day, we will stand back
And marvel at the height of our tree.
This tree will forever remain here on Earth
As our own special community.
May the tree grow forever,
Reaching all the way up to the heavens.

Where am I?

Pranam Dey, 8th Grade

I stand in the jungle
So fair, so bright
I see the animals around me
Hurrying and scurrying
It seems so busy for them

But it looks so easy for them
We believe that we have moved onward, moved forward
They all have a place in the great chain
But here I sit
Beneath a tree
And here I wonder what of me
What is my place in this chain
What am I so alienated, so disconnected?

More War?

Susmita Gorai

I wonder why there's another war
Deadly and destructive
So, houses are few
Nothing is new

WWI and WWII, each was a deadly war
WWIII and WWIV, do we want any more?

Brothers and sisters die together too soon
Mothers and fathers grieve toward the Moon

There is a cry for peace and love
I wonder where is the pure white dove?

The doves proclaim, "Pray silently for loved ones
Wish quietly for fewer guns

No more wars in the sea –
No more death to hurt you and me."

I wonder what the doves foresee?

Into the crystal ball, we have to see
A future bright with prosperity

আসা যাওয়া

শঙ্কর সেনগুপ্ত

সকাল গড়িয়ে দুপুর। শিবপদবাবুর চাপা উত্তেজনা এখন আর বাঁধ মানছে না। শিব ইলেকট্রিসিয়ানকে বকাঝকা দিয়ে কাজ খুব এগোচ্ছে না দেখে এখন প্রায় গালাগালিতে গিয়ে ঠেকেছে।

- কি বোকা-হাঁদার মত কথা বলছ? কাল অবধি গিজার কাজ করছিলো - আর আজকে বলছ কয়েল্ পুড়ে গেছে? কয়েল্ যদি পুড়ে কালো হয়ে গিয়েই থাকে - তা তোমার মত হাবা গবাকে দিয়ে কাজ হবে কি করে? আসল ইলেকট্রিসিয়ানকে ডাকতে হবে।

শিবুর মুখে কোন কথা নেই। দশবছর আগে দারোয়ান থেকে শুরু - ধীরে ধীরে শহরতলির এই গুটিকতক ফ্ল্যাটের এখন যাবতীয় সমস্যার প্রথম লাইন্ অফ্ সাপোর্ট হল শিবু। কারও মাইক্রোওয়েভ্ কাজ করছে না, কারও চিঠি এক্সপ্রেস পোস্টাপিসে গিয়ে মেইল করতে হবে, কারও ফ্রিজে দুধ পচে যাচ্ছে, কারও রেশন্ কার্ড রিনিউ করতে হবে - সবতে প্রথমেই শিবুর ডাক পড়বে। পাম্পরুমের মধ্যে শিবুর ফ্যামিলি মেম্বার আর পার্শ্ব পাথেয় বেড়েই চলেছে - বাবুদের দয়া মায়াতে। দেশেও টাকা পাঠিয়ে একটা পাকা ভিতের যোগাড় যন্তর চলছে। এরকম সিচুয়েশনে চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

আসল ইলেকট্রিসিয়ানের খোঁজে শিবপদবাবু পাশের ফ্ল্যাটে হাজির - এই যে সমরেশ, তোমার ইলেকট্রিসিয়ানকে আজ একটু ধার দিতেই হবে। নাহলে আমার নাতি ...

সমরেশ আর শিবপদবাবু বছর কুড়ি হল প্রতিবেশী। বয়সের তফাত প্রায় বছর কুড়ির - তবুও আলাপে আলোচনায় প্রায় সমবয়সী বন্ধুত্বের স্বাচ্ছন্দ্য। একমাত্র রান্তিরবেলা ছাড়া দুই ফ্ল্যাটের সদর দরজা সবসময় খোলা। অবাধ যাতায়াত। শিবপদবাবুর উত্তেজনার আগুনে কি করে জল ঢালতে হয় - একমাত্র ওই সমরেশই জানে ও তা করতে পারে। সমরেশের বাড়ি তৈরির ঠিকাদারি কারবার - শিবুকে দিয়ে কাজ না হলে সমরেশের ডাক পড়ে আসল মিস্তিরির খোঁজে।

- আরে রাখুন তো দাদা - এই ভর গ্রীষ্মে কেউ গিজারের জলে স্নান করবে কেন? কাল এনে দেব নয় - আজ ফ্লাইট্ নামতে তো সেই রাত আটটা - কাল ভোরে সমর চলে আসবে - আপনার জেটসেটর ছেলে বউ নাতি নাতিরী ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে গরম জলের বন্যা বইয়ে দেব। যা শিবু - তুই যা তো। দেখিস তাড়াতাড়ি আবার শুয়ে পড়িস না যেন। মালগুলো তুলতে হবে কিন্তু! শিবু এসেছিল পিছুপিছু। মুখ নামিয়ে, মাথা নাড়িয়ে এবার বেরিয়ে যায়।

- শিবুর উপর রাগ দেখিয়ে কি হবে? আমার, আপনার তো একই অবস্থা। এই বয়সে কোথায় আমাদের ছেলেরা জামাইরা দেখবে - তা তারা সবাই দেশছাড়া। এই কুড়িটা ফ্ল্যাটে কজনের ছেলেমেয়ে - বিদেশ ছাড়ুন - কলকাতায় থাকে? দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, দুবাই, লন্ডন, অ্যামেরিকা - সমরেশ বলে।

- লেখাপড়া শিখিয়ে যে কি হল - মাঝেমাঝে ভাবি এর চেয়ে হায়ার

সেকেন্ডারি ফেল্ করা ছেলে হলে হয়তো সঙ্গে থাকত ...

- আপনি যে উত্তেজনার মাথায় মাঝে মাঝে কি বলে বসেন, তা যাকগে বৌদি কোথায়, দেখছি না যে?

- ডিমভরা পার্শের খোঁজে ছুটেছে গড়িয়াহাটে। এই গরমে। একবার অল্‌রেডি লোকাল্ বাজার ঘুরে এসেছে। তা সকালের মাছ নাকি ছোট - ডিমের নাম গন্ধও নেই তাতে। ছেলে বলেছে - সিঙ্গাপুর থেকে কল্ করেছিল কাল - ডিম ভরা পার্শে চাই। আমার জন্য ভাত সেক্, কুমড়া সেক্ ওই ডাইনিং টেবিলে ঢাকা দেওয়া - আর ছেলের জন্য মাছের খোঁজে সারাদিন চরকি পাক্। কবে থেকে বলছি একটু চিতল মাছের ঝাল কর - কে শোনে কার কথা - আর ছেলের একটা আর্জিতে ...। অবশ্য আমি তো আর অ্যামেরিকায় থাকি না। থাকলে হয়তো রোজ ...

- আরে রাখুন তো দাদা, আপনি তো ক্রনিক্ পেটের রুগী, চিতল মাছের ঝাল কি আর ওই পেটে সহিবে? তারপরে তো ওই বৌদিকেই ছুটতে হবে, এনটেরোডাভায়ার্ম আনরে, ডাক্তারকে ডাকরে। যান, প্রায় দুটো তো বাজতে চলল, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনার তো আবার দিবানিদ্রা না হলে চলে না। পাঁচটা নাগাদ গাড়ি এসে যাবে, সাতটার আগেই পৌঁছে যাবেন এয়ারপোর্টে।

- হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। একটু গড়িয়ে না নিলেই নয়, বুকটা বড় ধড়ফড় করছে আজ।

সর্বজয়া বাড়ি ফেরেন যখন, ঘড়িতে প্রায় পৌনে তিনটে। শিবপদ বাবু ততক্ষণে গভীর ঘুমে মগ্ন। কাটা মাছগুলোতে হলুদ, লক্ষা গুঁড়ো মাখিয়ে, কাঁচালক্ষা কুচিয়ে রেখে গোটা সর্ষের বোতলটা বের করে একবার শিলনোড়ার দিকে তাকালেন সর্বজয়া। তারপরে কি মনে করে বাথরুমে ঢোকেন। গরমে মাথাটা তেতে গেছে। একটু স্নান না করলেই নয়।

স্নান সেরে ভাতে ভাত খেয়ে নিয়ে আলগা চোখ রাখেন টিভিতে, এলোমেলো অনেক চিন্তা। গাড়িতে ডাইভার ও শিবপদ বাবুই যাবেন। বাস্ক, সুটকেশ্, প্লাস্ চারজন বিদেশাগত যাত্রী। সমরেশ বোধহয় টাটা সুমোর আয়োজন করেছে। তাও তো গতবার একটা এক্সট্রা গাড়ি লেগেছিল মালপত্রের জন্য। তবে মনে হয় না মালপত্র এবার অত হবে, সিঙ্গাপুরে থামা, আর নাতি-নাতিরী এখন পাটি ট্রেনেই, গতবার তো দুই সুটকেশ্ ভর্তি ডায়পারই এনেছিল। আর এবার তো বারবার বলে দিয়েছেন যেন গিফট্ কিছু না আনে, দেশে তো এখন সবই পাওয়া যায়। টাটা সুমো এয়ারপোর্টে রওনা দিলেই সর্ষেটা বেটে নিতে হবে - ছেলে বৌ আসতে আসতে ভাত, মাছটি বেড়ে দেবেন ...

সর্বজয়া এমনিতে দুপুরে ঘুমোন না - আজ অলস, অধৈর্য দুপুরের শেষের দিকে একটু ঢলে পড়েন সোফাতেই।

দোতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে উঠতে শিবপদ বাবুর বুক হাঁফ ধরে একটু।

সর্বজয়াকে বলেন এগিয়ে যেতে। প্রথম যখন ফ্ল্যাটের লটারিতে চারতলার অ্যালাটমেন্ট পান, তখন কি আনন্দই না হয়েছিল। আজকাল মনে হয় একতলার বাসিন্দা হলেই ভাল হত। একপাশে সরে গিয়ে সিঁড়ির রেলিংটা একটু চেপে ধরেন।

সর্বজয়া পাশ কাটিয়ে উঠে যান তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে। স্বামীর বুকের চেয়ে মনের চাপই বেশি যে আজ। ঘন্টা দুয়েক আগে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট্‌ দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ছেড়ে গেছে, আজকে দুটো গাড়ি নিয়ে গেছিলেন সবাই মিলে বিদায় জানাতে ছেলেকে, বৌকে। নাতি, নাতনিদের গালটা একবার শেষবারের মত টিপে দিতে। চোঁট চেপে বলতে - ফোনটা একটু ঘন ঘন করিস। দশদিনের পর বাড়ি আজ ভীষণ খালি, কিন্তু সে বাড়িতে তো ফিরতেই হবে, ঢুকতে তো হবেই। মন ভেঙ্গে গেলেও স্বামীর সামনে সে দুঃখ প্রকাশ করা যাবে না। তার সময় আসবে পরে।

- আমি আর আজ খাব না কিছু, গতকাল রাত্রের আমিনিয়ার চিকেন্‌ কালিয়ার অম্বল বেশ বেগ দিচ্ছে এখন, - শিবপদ বলেন সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে।

সর্বজয়া বলেন - আমিও তাই ভাবছিলাম। একটু নুন লেবুর সরবত করেনি। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি চল।

গত দশ রাতের পরিচিতি এই ঘরের সঙ্গে। ছেলের ছোটবেলার শোবার ঘর। এখন ছেলে এলে নিজেদের বড় বেডরুমটা ছেড়ে দেন ছেলে বৌকে। চলে আসেন এই ঘরে কয়েকটা রাত্রের জন্য। আজ আর নিজেদের ঘরের বিছানার চাদর বদলানোর ফুরসত হয়নি। তাই ফিরে এসেছেন আরেকটা রাত্রের জন্য। ছেলের খাটে শুয়েছেন একটু চাপাচাপি করেই।

অন্ধকার ঘরে কার্পুর চোখেই ঘুম নেই।

- গতকাল রাত্রে আমাদের মাঝখানে এসে রিয়া শুয়েছিল, তখন তো জায়গার অভাব মনে হয়নি। দশটা দিন কিরকম কেটে গেল ... - শিবপদ শুরু করেন।

দশটা দিন বড় কম। শপিং, রেস্টুরেন্ট, বন্ধুবান্ধব করে আমাদের সঙ্গে আর কটা ঘন্টাই বা কাটাল? তাও রিয়া, তুতুনকে রেখে যেত বাড়িতে, ওদেরকে কাছে পেয়েছি অনেকটা।

- যাই বল, তাও তো শ্বশুরবাড়ির ঝামেলা নেই। বেয়াই মশায়রা তো এখন ওদেশে ছেলের কাছেই বেশির ভাগ সময়টা কাটান। পুরো সময়টা তাই ওদেরকে কাছে পেলে। আর বন্ধুবান্ধব বলতে তো ঐ শৈবাল, আর সবাই তো ওর মতই বিদেশে। তা শপিংটা একটু বেশিই হল মনে হচ্ছে, আর কলকাতায় যে এত নতুন দোকান হয়েছে কে জানত?

সর্বজয়ার ঘোরাঘুরিটা একটু ভালই হয়েছে। এ বয়সে এখন তো ওই ছেলে বৌয়ের সাহচর্যে নতুন এলাকার অজানা দোকানে ঘোরাঘুরি। এমনিতে দৈনন্দিন আর কোথায় বা যাওয়া? ওই বড়জোর গত চল্লিশ বছরের পরিচিতি যার সঙ্গে, মিনিবাসে চড়ে গড়িয়াহাট। সল্টলেকের ওদিকে যে এত দোকান হয়েছে কে জানত? সবই এয়ার কন্ডিশনড। একটা আইডিয়া করে নেওয়া গেল, কোথায় কি পাওয়া যায়। ছেলে বৌই চাপাচাপি করে দেখিয়ে দিয়েছে। বলেছে আগামী বছর যখন যাবে, তখন এই দোকানের এই আর ঐ দেখানের সেই-র তালিকা ই-মেইল করে দেবে। - ওদেশে বসে খবর রাখেও বটে। ছেলেদের পাঞ্জাবিতে কাঁথা নকশা! - সর্বজয়া বলে ওঠেন।

- শৈবালটা করেছে অনেক। বৌয়ের হারমোনিয়াম, কালিঘাটের পট, এমনকি যামিনী রায়ের অরিজিনাল আঁকা, খবর রাখে বটে! ছেলেটা সারা বছর আমাদের কম খোঁজ নেয় নাকি?

- ও তো কিরকম পড়াশুনো শেষ করে দেশে ফিরে এল। বেশ তো মানিয়ে নিয়েছে। আমাদের ছেলেটাও তো একবার চেষ্টা করতে পারত, তা না আজ কত বছর হয়ে গেল ...

- ওই আবার শুরু করলে! খারাপ কি আছি বল? বছর বছর বিদেশ যাচ্ছি, হ্যাঁ, খালি গত বছর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। টাকা পয়সার টানাটানিও নেই, বড় খরচা দরকার হলেও দেখি ব্যাঙ্কে ডলার ভান্ডিয়ে টাকা জমা পড়ছে। ঘনঘন ফোন, ই-মেইল, ওয়েব সাইটে ছবি... হ্যাঁ, খালি মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতা ... - শিবপদবাবুর ঘুমে দু চোখ জড়িয়ে আসে।

মানুষটা একেবারে অভ্যাসের জীব - সর্বজয়া মনে মনে ভাবেন। একদিক দিয়ে ভাল, আজ রাত্রে কিরকম সহজে ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিকই তো বলেছে, এ জীবন মন্দ কি? এই তো মাস কয়েকের মধ্যে আবার স্বামী-স্ত্রীতে রওনা দেবেন। আজকাল ছেলে বৌ দুজনেই চাকরি করে। সামারে নাতি-নাতনীর স্কুলে ছুটি। বেশ কয়েক মাস নাতি-নাতনীর সঙ্গে কাটিয়ে আসবেন।

পাশের মানুষটা বিদেশ যাওয়ার সময় হলেই হাসি ঠাট্টা করে বলেন - এই যে সমরেশ, এপ্রিল মাস এল, আমরা যাব বেবি সিটিং করতে! তা তুমি এবার মেয়ে জামাই কে বল না, তোমারও বেবি সিটিং করার ইচ্ছে হয়েছে। শমীদেব ব্যাপারটা কি বলতো, কম বছর তো হলনা বিয়ে হয়েছে?

কিন্তু তাও তো ডাকে। ইচ্ছে করলে ছেলে বেবি সিটার রাখতে পারে, কিন্না ন্যানী। আদার করে বলে - খালি বেবি সিটিং নয়, বাংলাটাও শিখিয়ে দিও ... কিন্তু তাও মনে হয় যেন সবসময় কাছে পেলে হয়তো আরও ভাল হত। খালি ঘুরেফিরে মনে বাজে পরিচিত, অপরিচিতের সমবেদনাশীল একটা খোঁচানো পদ - এক ছেলের মা হয়ে কি করে ছেলেকে যেতে দিলেন অত দূরে? আবছা মনে পড়ে ছেলের কাছে একই প্রশ্ন রেখেছিলেন, অন্যভাবে, অন্য কথায়। ছেলে বলেছিল - আমি পৃথিবীকে পরখ করে দেখতে চাই, খালি টিভি-র পর্দায় কি ম্যাগাজিনের পাতায় নয়।

এলোমেলা চিন্তায় রাত আরও গভীর হয়। পাশ ফিরে জানলার দিকে মুখ রাখেন। রাস্তার ইলেকট্রিক আলোর হলুদ গাছের ডালে লেগে রয়েছে। মনে পড়ে অনেক বছর আগে ছেলের সঙ্গে এসে বসেছিলেন এই ঘরে সারারাত। ছেলে সেদিন গভীর জ্বরে বেহুঁস। সেদিন রাত্রের জানলার বাইরের সেই আলোর আর আজকের এই আলোর মধ্যে তফাত আর কত? কিছু জিনিস বদলায় না। আর কত জিনিস না বদলানোর ভয়ে চিরতরে দূরে, আড়ালে চলে যায়। ✿

বসুমতীর কেরামতি

নবনীতা দেব সেন

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

সীতা বেচারীর মনটা বড় বিষণ্ণ। রামের ওপর রেগেমেগে তো হুট করে মায়ের কোলে চড়ে পাতালে চলে এসেছেন, ওদিকে ছোট ছোট ছেলে দুটো যে রয়ে গেল মর্ত্যধামে। তাদের কী হবে? বাপের তো ঐ স্বভাব! ছেলেপুলের দিকে নজরই দেবে না। সীতার চোখে ঘুম নেই।

মা বসুমতী চরের মুখে অযোধ্যার খবর পাচ্ছেন। শুনছেন সেখানেও শান্তি নেই। যদিও প্রজাদের কাছে রামচন্দ্রের মুখরন্ধে হয়েছে। লবকুশকে দেখার পর থেকে প্রজারা আর তাঁকে গোপনে গোপনে আঁটকুড়ো রাজা বলে মনে করছে না। অযোধ্যায় গুজগুজ ফুসফুস তো কম চলত না! রামের রকমসকম প্রজাদের সুবিধের মনে হত না। সোনার প্রতিমা বৌকে তাড়িয়ে দিয়ে যে লোক সোনার তৈরি পুতুল নিয়েই দিব্যি ঘর করতে পারে, তার মধ্যে বিল্কুল কুছ না কুছ গড়বড় হয়। নইলে যার পূজনীয় বাবার ঘরে তিনশো পঞ্চাশ জন পত্নী ছিল; তার ঘরে কিনা একটাও নারী নেই? গতিক সুবিধের লাগত না। প্রজাদের ভাবনা চিন্তা রাজার কানেও এসে পৌঁছেছিল বলেই না বান্ধীকির আশ্রমে দূত পাঠানো? এখন জগজ্জনে জেনে গেছে যে, হ্যাঁ রামচন্দ্র দু-দুটো ব্যাটার বাপ বটে!

সত্যি বলতে কি, বসুমতী জানেন, এই লব-কুশ যে জন্মেছিল, তা নেহাৎ তাঁর সখী মা- যষ্টির কৃপায়। সীতার প্রতি তাঁর মমতার জন্যে। নইলে রামচন্দ্রের তো যত প্রেম মুখেই! লম্বা লম্বা অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত কাব্যময় প্রণয়বাক্য রচনায় তিনি যত এক্সপার্ট, বিশুদ্ধ প্রণয়কেলিতে তাঁর তত নৈপুণ্য নেই। রামচন্দ্রের চেয়ে এ ব্যাপারে শ্মশানবাসী শিব চের ভাল। জটাভূটে গঙ্গাদেবীকে লুকিয়ে রেখে, বাঁ কোলে পার্বতীকে বসিয়ে, গাঁজাভাস্ত্র করে দিব্যি মৌজে আছেন। বউ-অন্ত প্রাণ! তবে হ্যাঁ, ছেলেপুলের ব্যাপারে দেবদেবীদের ব্যবস্থাটা একটু আলাদা। পার্বতীর দুই ছেলে, কার্তিক-গণেশ কেউই তাঁর গর্ভে জাত নয়। সেদিক থেকে লব-কুশের কপাল ভাল। সীতা প্রকৃত অর্থেই তাদের গর্ভে ধারণ করেছেন। আর একবার দেখলে কাউকে বলে দিতে হবে না সীতার সন্তান দুটি কার মহান কীর্তি। অবিকল দুটি আর্শির মত। ছেলেরা বাপের ছায়া। তাদের চাঁদ মুখ দেখেই প্রজাদের সব সন্দেহ দূর হয়েছিল। কিন্তু তারা শান্ত হলে কি হবে, রামচন্দ্রের যে শান্তি নেই। রামচন্দ্রের সন্দেহ বাতিকের জ্বালায় সীতা অতিষ্ঠ। কেবল কি একা রাবণ? লক্ষ্মণের প্রতি তো চিরকাল সন্দেহ ছিলই - এখন ভরত, শত্রুঘ্ন মায় সুমন্ত্র পর্যন্ত কেউ বাদ যাচ্ছে না। সীতা লজ্জায়, ঘেন্নায় কমপ্লেক্স পর্যন্ত করতে পারছেন না শাশুড়িদের কাছে। এ-হেন অবস্থায় রাম আরেক দফা অগ্নিপরীক্ষার দিন স্থির করলেন।

বারবার পৃথিবীর মানুষের সামনে সিংহের সার্কাস দেখানোর মতন সীতাকে দিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেওয়াতে রামের খুব ভাল লাগে। সীতা ঝাঁপ দেবেন, ম্যাজিকের মতন আগুন নিবে যাবে, অগ্নিদেব সশরীরে সীতাকে কোলে করে

উঠে আসবেন; ‘এই মেয়ে দেবীতুল্যা, অপাপবিদ্ধা’ - বলে রামের হাতে তুলে দেবেন; এই দৃশ্য যারাই দেখবে তারাই বিমোহিত হতে বাধ্য। অযোধ্যাতে কেউ এ ম্যাজিক-শোটা দেখেনি। ওটা হয়েছিল লক্ষ্যপুরীতে।

রামরাজ্যে একবার এই পারফরম্যান্সটা হওয়া দরকার। একটু যেন রাজভক্তিতে ভাঁটা পড়েছে ইদানীং। সদাসর্বদা সুখে স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে যা হয় আর কি - রামরাজ্যে লোকেদের অভ্যেস হয়ে গেছে! লোকে ভুলেই গেছে রামচন্দ্রের লক্ষ্যবিজয়ের বৃত্তান্ত। হাজার হোক, যুদ্ধটা তো অযোধ্যাতে হয়নি! প্রজাদের গায়ে লাগেনি যুদ্ধের আঁচ। কাউকে আঙ্গুলটিও নাড়াতে হয়নি সীতা উদ্ধারের জন্যে। এ যুদ্ধে অযোধ্যাবাসীর রক্তপাত হয়নি; স্বজনবিচ্ছেদ হয়নি, অন্নসঙ্কট হয়নি, ধর্মসঙ্কট হয়নি - যুদ্ধবিগ্রহে একটা দেশের যা যা লোকসান হয়, যা যা সমস্যা হয়, তার কোনটাই হয়নি এখানে। যে যুদ্ধের কোন স্মৃতিই নেই, কেবল শোনা কথা, তাই নিয়ে গর্ব করা আর কতদিন পোষায়? হ্যাঁ ‘যুদ্ধ’ বুঝেছিল লক্ষ্যবাসী, ধনেপ্রাণে ধ্বংস হয়ে গেছে তারা। অ-যোদ্ধা = যে ভূমিতে যুদ্ধ হয়না। কিন্তু সেই ভূমিতে নীচতা, কুটিলতা, হীনতা, দীনতা হয় না, অন্তর্দ্বন্দ্ব হয় না, গোপনে বিষ ঢালাঢালি হয়না, এমন তো নয়! সে সমস্তই হাছিল।

প্রজারা যতই সুখে থাক, রামচন্দ্রের মনে না ছিল সুখ, না ছিল শান্তি। অনেক ভেবেচিন্তেই লক্ষ্মণকে পাঠিয়েছিলেন বান্ধীকির আশ্রমে যজ্ঞসভার নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে। সবই প্ল্যানমত ঠিকঠাক চলছিল, হঠাৎ সীতা যে কী ছেলেমানুষী করে ফেললেন! কথা ছিল দৈবদৃশ্যের - সেটা অবশ্য ঘটল, তবে ফল হল বিপরীত। ধরিত্রীকন্যা সীতারও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল - তিনি কেঁদে উঠে মায়ের কাছে ফিরে গেলেন। হবি তো হ’ প্রজারাও কিনা সব সীতারই পক্ষে! তারা বলছে, ‘সীতার আবার সতীত্ব পরীক্ষা কী? পরীক্ষার রেজাল্ট তো ছেলেদের মুখেই ছেপে বেরিয়ে গেছে’! তারা বলছে - ‘মহারাজ রামচন্দ্রের বাপু সবতাতেই বাড়াবাড়ি।’

প্রজাদের দাবী - ‘সীতাদেবীকে ফেরৎ চাই। রাজ্যের রাজলক্ষ্মীকে ফেরৎ চাই।’

এদিকে রামচন্দ্রকে ঠিক ‘নিরহঙ্কার পুরুষ’ বলা যায় না। যে বৌ রাগ দেখিয়ে চলে গেছে, তার মান ভাঙাতে যাবেন রাম? নো স্যার! তিনি কেঁটাকুর নন। তাঁর জীবনে মানভঞ্জন পাল্লা নেই।

কিন্তু প্রজারা সে কথা মানলে তো! মহা অশান্তি চলছে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যা রাজ্যে। বসুমতী শুনতে পান সবই।

এদিকে সীতারও পাতালে মন বসছে না, যদিও তাঁকে নাগরাজ্যে ব্রতেশ্বরী দেবী বলে পূজো করা হচ্ছে, যত্ন আন্তরিক, অ্যাটেনশনের কোন অভাব নেই। জীবনে এত আদর আগে কখনও জোটেনি সীতার। কিছু চাইবার আগেই মা বসুমতী আদুরে মেয়ের জন্যে সেই জিনিসটি আনিয় রাখছেন। এমন মনোযোগ সীতা পাননি জীবনে, এক রাবণরাজার লঙ্কাদ্বীপে ছাড়া। তা সে তো মনোযোগ নয়, সে ছিল গোলযোগ। ব্রতেশ্বরী হয়ে সীতার মন্দ লাগছে না। পাতালবাসীরা তাঁকে দেবী বলে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছে, নৈবেদ্য দেয়, পূজো দেয়, প্রার্থনা জানায়, ভজন শোনায়ে। সীতার গুণগান করে তাঁর মন ভাল রাখে। সীতাও যথাসাধ্য ভক্তদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন তাঁর লক্ষ্মীর বাঁপি থেকে। মায়ের সংসারে আনন্দের বান ডেকেছে - এমন ভাবে সীতাকে কোনদিনই কোলে পাননি বসুমতী। মেয়ে মায়ের বাড়ি এসেছে - আহা, কত, কত, কতকাল পরে।

সবই তো ভাল, এদিকে সীতার মন যে কিছুতেই বাগ মানে না! তাঁর হয়েছে এক জ্বালা! তাঁর ঘাস দেখলেও 'লব-কুশ', ফল দেখলেও 'লব-কুশ', নাগেদের ছেলেপুলেরা ইস্কুলে যাচ্ছে বই-শেলেট নিয়ে, সেই দৃশ্য দেখলেও 'হায় লব-কুশ।' এমন করলে চলবে কেন? শরীর যে ভেঙ্গে পড়বে। মা বসুমতী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। হাতে করে মিষ্টান্ন ধরে বসে থাকবে সীতা, মুখে তুলতে পারবে না। 'লবটা বড্ড মিঠাই খেতে ভালবাসে।' মাছের মুড়োটি পাতের একপাশে ঠেলে দেবে। 'আহা, মুড়ো খেতে কুশ দারুণ এক্সপার্ট।' সুখি উঠছে, 'আহা, কেমন সুন্দর মিঠে গোলাপী আকাশটা, ঠিক যেন লব সোনার গাল দুটি।' ফালি চাঁদ উঠলে, 'আহা, আজ চাঁদের মুখখানি ঠিক যেন আমার কুশের কপালটির মতন।'

মা বসুমতীর আর সহ্য হল না। তিনি বাসুকি নাগকে ডেকে পাঠালেন। মহাবলী, মহাতেজা বাসুকি এলেন। - 'বাসুকি, বাছা, একটা ব্যবস্থা তো করতে হয়। তুমি যাও, যেমন করে পার অযোধ্যার রাজপুরী থেকে আমার নাতি দুটিকে ধরে এখানে নিয়ে এস। রাম যেন আবার দেখে-টেখে না ফেলেন! একদম চুপচাপ ছেলে দুটিকে সরিয়ে ফেলে - সিঁধে আমার কাছে এনে দেবে। কী? পারবে তো?' বাসুকি হেসে বললেন - 'কী যে বলেন মা, এটুকু পারব না? আমি হচ্ছি বাসুকি, দুটো বাচ্চা ছেলেকে কিডন্যাপ করে আনতে পারব না? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!' বসুমতী হাসলেন। মর্ত্যের ঘাসে বকুলফুল, কামিনীফুল ঝড়ে পড়ল। সুবাসে পরিপূর্ণ হল দশদিক।

বাসুকি চললেন অযোধ্যা নগরীতে। সীতার মন ভাল করে দিতে হবে। সন্তান বিহনে কি মায়ের মন আনন্দে থাকে? দিনে একশোবার পূজো পেলেই কি তাতে শান্তি পাওয়া যায়? ব্রতেশ্বরীর বুকের মধ্যে যে আরেকটা ব্রত আছে। পুত্রেষ্ট্রব্রত!

অযোধ্যায় লব-কুশ ছাড়া-গরু হয়ে বেড়ায়। রামচন্দ্রের ওদের দিকে নজর দেবার সময় কই? ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করা তাঁর অভ্যাসও নেই। আশ্রমে কঠোর ডিসিপ্লিন ছিল - বাল্মীকির নিয়মকানুনের এদিক-উদিক হবার যো ছিল না। তার ওপর আবার সীতার চব্বিশ ঘন্টার কড়া নজর।

এখানে বাল্মীকি নেই, সীতাও নেই, রাজবাড়িতে মহারাজের আদুরে দুলাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুজনে। তাদের শাসন করারও কেউ নেই। তাদের কোন

বাঁধন নেই। তারা যা খুশী তাই করে বেড়াচ্ছে, যেখানে খুশী যাচ্ছে, যা ইচ্ছে তাই খাচ্ছে। পড়ে না। কারুর কথা শোনে না। যাকে বলে ঐ 'এ-য় চড়ে নাচছে দু-ভাই', অবিকল তাই। সাঁতরে সরযুদী এপার ওপার করছে, নারকোল গাছে উঠে ডাব পেড়ে খাচ্ছে, ভরদুপুরে খাঁ খাঁ রোদে তেপান্তরে ঘোড়দৌড় প্র্যাকটিস করছে। মা চলে গিয়ে থেকে ওরা কেমন জেদী, আর একগুঁয়ে প্রকৃতির হয়ে উঠছে দিন-কে-দিন। সুমন্ত্র তো সেদিন রাজপুত্রদের বকুনিই দিয়ে ফেললেন। রথ ছুটিয়ে দুই ভাই চলে গেছে সেই শত যোজন দূরে ক্ষুধাজিৎ রাজার রাজ্যে। ফিরল যখন ঘোড়াদের অবস্থা কাহিল, নিজেদেরও। ভয়ডর বলে তো কিছু নেই প্রাণে। সেই আশ্রমবাস থেকেই অসম সাহসী দুজনে, আর অস্ত্রবিদ্যায় অতটা পারদর্শিতা এ বয়সে আর রামলক্ষ্মণেরও নেই। তবু বয়েস আর কতটুকু? বিচারবুদ্ধি তো পাকেনি।

তবু লক্ষণকে মানে একটু আধটু, আর ভালবাসে কেবল হনুমানকে। বাপের কোন কথায়ই তারা কান দেয় না। রাম কিছু বললে, অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে গুণগুণ করে রামায়ণ গান ভাঁজে!

প্রাসাদসুদু সবাই টের পাচ্ছে, হ্যাঁ এ রামচন্দ্রের রক্ত! রামও বুঝেছেন, বুঝেছেন এরা বাপের ব্যাটা হয়েছে, জেদীর চূড়ামণি। সীতার ওপরই রাগ হয়ে যাচ্ছে - সে এখানে থাকলে ওরা এমন হত না। কৈ সীতা থাকতে তো এরকম মূর্তি বেরোয়নি? এমন বদরাগী হয়ে গেছে মেয়েটা বনবাসে থাকতে থাকতে, যে কিছু বলতে না বলতেই বিস্ফোরণ! চটেমটে জন্মের শোধ নিয়ে যে চলে গেলি, কচি ছেলেদুটোর কথাও তো একবার ভাবলি না? সত্যি, মেয়েমানুষের অত রাগ ভাল নয়।

একদিকে ছেলেগুলোর এই দশা, অন্যদিকে প্রজারা চাপ দিচ্ছে 'আমাদের রাণী ফেরৎ চাই।' রাম মুস্কিলে পড়েছেন। ভাবছেন, বাল্মীকিকে ডেকে পাঠাবেন, একটু পরামর্শ করতে। সীতাকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারেন।

উঁকি মেরে দেখলেন, লব-কুশ নেট প্র্যাক্টিস করছে। লব বল করছে, কুশ ব্যাটে। শত্রুঘ্নর ছেলেরা ফিল্ডিং করছে। লক্ষ্মণের ছেলেরা ব্যাট করবে বলে অপেক্ষা করছে। ভরতের ছেলেরা, তাদের বাবারই মতন, মামার বাড়ি গেছে।

বাসুকি টুক করে রূপ বদল করে ফেললেন। হাষ্টপুষ্টি একটি মেঠো ইঁদুর হয়ে তিনি গর্ত থেকে বেরিয়ে এলেন, পুট করে বলটি ধরে নিয়ে এক দৌড়ে গর্তের মধ্যে সঁদিয়ে গেলেন।

অমনি 'ধর ধর' করে লব তো ধাওয়া করে গেল একেবারে ইঁদুরের গর্তের ভেতর। তার পেছু পেছু গর্তের ভেতরে ঢুকে পড়েছে কুশও। অন্যান্য ভাইয়েরা হঠাৎ অমন গর্তের ভেতরে ঢুকে পড়ার ঝুঁকি নিতে সাহস করল না।

বাসুকির প্ল্যান কম্প্লীট সাক্সেস, দুটো বাচ্চা কিডন্যাপ করতে তাঁর কোন পরিশ্রমই হল না। লব-কুশ নিজেরাই সুডঙ্গপথে শৌ-ও-ও-ও করে নেমে এসে বুপ করে এরোরে দিদিমার কোলের মাঝখানটিতে পড়ল। বাসুকি এবার নিজরূপ ধারণ করে বলটি লবকে ফিরিয়ে দিলেন। আর হাসি হাসি মুখে বললেন - 'তোমাদের মামার বাড়িতে নিয়ে এলুম, ইনি তোমাদের দিদিমা।'

লব-কুশ বললে - ‘চিনি, চিনি, ইনিই তো আমার মাকে নিয়ে এসেছেন।’
বসুমতী দুই নাতি কোলে পাতালের সিংহাসন আলো করে বসলেন।
দাসীদের বললেন - ‘যাও মা, তোমরা গিয়ে শিগগির দিদিমণিকে খবর দাও
গে। বল, আমি ডাকছি।’

দিদিমার কোলে বসামাত্র লব-কুশের অন্তর যেন শীতল জলে ধুয়ে গেল।
সব দুঃখ গলে গেল। সব দুঃখ শান্ত হয়ে এল। সব জেদীপণা বাতাসে উবে
গেল। বসুমতীর আদরে তাদের ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

- ‘মা কই’? তারই মধ্যে লব-কুশ বলল। ‘দিদিমা, আমাদের মা কই?’
- ‘ঐ যে, তোমাদের মা আসছেন।’

বিষাদপ্রতিমা সীতা মায়ের ঘরে ঢুকলেন। লঙ্কার বাগিচায়ও তাঁকে এত
প্রিয়মান লাগেনি। স্বামীবিরহ কষ্টের, কিন্তু সন্তানবিরহ আরও কষ্টের। ঘরে
ঢুকে তো সীতার চক্ষুস্থির। এ কি সত্যি? না কি মা বসুমতীর মায়া? এ যে
পাতালে একসঙ্গে চাঁদসূখ্যের উদয়?

- ‘মা! মা! মা!’
- ‘আমার সোণামণি! আমার ধনমণি!’
- ‘মা! মা! মা!’
- ‘আমার লবুয়াই! আমার কুশুয়াই!’
- ‘মা! মা! মা!’
তিনজনে তিনজনকে জড়িয়ে ধরেছে।

- ‘থাক। মা তো রইলেন। তোমরা দাদাভাইরা এখন যাও তো ছুটে গিয়ে
পাতালগঙ্গার মিষ্টি জলে হাত পা মুখ ধুয়ে আচমন করে এস, তোমাদের
জল খাবার দিচ্ছি। খেতে খেতে গল্পো করবে মায়ের সঙ্গে।’ বসুমতী অর্ডার
করলেন। নাগদের দেশের জলখাবার! সে তো ত্রিভুবন-বিখ্যাত। লব-কুশ
ছুটল হাত-পা ধুতে। সীতা গিয়ে বসুমতী মাকে জড়িয়ে ধরলেন।

- ‘মা, তুমি সব বোঝ। তুমি সব পার।’

বসুমতী হাসলেন। মর্ত্যধামে স্বর্ণচাঁপা ফুটল। গন্ধে ভরে গেল আকাশ-
বাতাস।

লব-কুশকে পেয়ে অবধি সীতার চোখেমুখে হাসি উপছে পড়ছে। ব্রতেশ্বরীর
মন্দিরে দেবীর ঔজ্জ্বল্য শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে এসে লব-কুশের
অন্য মূর্তি। নাগেদের মধ্যে প্রচন্ড কড়া ডিসিপ্লিন - নাগশিশুরা যথেষ্ট বিহার
করে না। তারা সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত। লব-কুশ এখানে এসে তাদেরই
মতন হয়েছে। নাগ-বালকদের সঙ্গে তারা কত কী শিখছে। কঠিন অস্ত্রবিদ্যা
তো তারা জানতই, আর জানত রামায়ণ গান করতে। এখানে এসে সেবা-
শুশ্রূষা, সেলাই-ফোঁড়াই, রান্না-বান্না, নৃত্য-গীত, নাট্যাভিনয়, যোগাসন,
কুংফু-ক্যারাটে সবই শিখল। এমনিভাবে লব-কুশ নাগলোকে থেকেই
অযোধ্যার রাজ সিংহাসনের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকল। সীতার মনে যত
আনন্দ, বসুমতীর প্রাণে তত শান্তি। রামচন্দ্রের ওপর মান-অভিমানের কথা
মনেই রইল না যেন তাঁদের।

অযোধ্যানগরী উথালপাথাল। প্রজারা ক্ষেপে উঠেছে। লব-কুশকে পাওয়া
যাচ্ছে না। প্রথমে সীতাদেবী, তারপরে লব-কুশ। নিশ্চয়ই রামচন্দ্রই কোথাও
সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর তো যত মায়া-মমতা সব কেবল লক্ষ্মণ আর ভরত-
শত্রুঘ্নের ছেলেগুলির ওপর। তাই তো এতদিন লব-কুশকে আনেইনি
প্রাসাদে। লব-কুশ গুঁর চোখের বালি। রামই নিশ্চয়ই কিছুমিছু করেছেন।

এতদিন তারা ‘সীতা চাই, সীতা চাই’ শ্লোগান দিয়ে শোভাযাত্রা বের করছিল,
এবার অন্য পথ ধরল।

লাগাতার অযোধ্যা বন্ধ চলবে যতদিন না লব-কুশকে পাওয়া যাচ্ছে।
সীতাসমেত লব-কুশকে ফিরিয়ে দিতে হবে অযোধ্যাবাসীদের কাছে।
প্রজাদের মেজাজের গরমে রামরাজ্য গলে যায় আর কি! দোকানপাট
বাজারহাট সব বন্ধ। বিদেশ থেকে ব্যাপারীরা বাণিজ্য করতে এসে ফিরে
যাচ্ছে। ভ্রমণকারীরা বেড়াতে এসে না পাচ্ছে রথ, না অশ্ব, না সরাইখানা।
সবই বন্ধ। তারা উপবনে বসে ক্যাম্পিং করে উপনগরুলোর বারোটা বাজিয়ে
দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। সরযুদীতে নৌকা চলাচল বন্ধ। জেলেরা মাছ ধরছে না।
সর্বাত্মক বন্ধ। এভাবে চললে সবাই ধনে-প্রাণে মারা পড়বে।
রামচন্দ্রের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ভাবছিলেন যৌবরাজ্যে অভিষেকের
দিন স্থির করবেন - সব রাজপুত্রদের এক একটি রাজ্যের যুবরাজ ঘোষণা
করে দেবেন - এরই মধ্যে এই কাণ্ড।

গেলই বা কোথায় দূরন্ত ছেলে দুটো?

রামচন্দ্র চতুর্দিকে চর পাঠালেন। দূরে দূরে। ওদের যেমন বেপরোয়া স্বভাব,
কে জানে কোন সুদূর পরদেশে চলে গেছে!
কিন্তু না। অশ্বশালে সবগুলি ঘোড়া মজুত। রথও নেয়নি। ঘোড়াও না,
নৌকোও না। পায়ে হেঁটে আর কতদূর যাবে?

চরেরা ফিরে এল। লব-কুশ কোথাও নেই। শুনেই প্রজারা আরও ক্ষেপে
উঠেছে।

- কোথায় তাদের শেষবার দেখা গেছে?
- খেলার মাঠে।
- কে দেখেছে?
- লক্ষ্মণের ছেলেরা, শত্রুঘ্নের ছেলেরা।
- ডাক তাদের।
- কোথায় গেল লব-কুশ?
- ‘বল খুঁজতে খুঁজতে ইঁদুরের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে হারিয়ে গেছে।’
- ‘ইয়ার্কি মারার সময় এটা নয়, সত্য বল।’
- ‘সত্যিই বলছি। বল খুঁজতে খুঁজতে...’
- ‘ইঁদুরের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে হারিয়ে গেল।’

রাজা রামচন্দ্র বজ্রনির্ধোষে ভেংচি কাটেন প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদের। তাঁর আর ধৈর্য
থাকছে না।

- ‘সত্য বল! তোমরা না ইক্ষাকু বংশের রাজপুত্র? তোমাদের আত্মসম্মান
কই?’

- ‘সত্যিই তো বলছি। তাত মহারাজ।’

রাজপুত্রের বেচারীরা কেঁদে ফেলল। সেই কান্না দেখে, মাঠের ইঁদুর আর কেঁচোদের দুঃখ হল। রামরাজ্য বলে কথা! তক্ষুণি ইঁদুর আর কেঁচো সেধে সেধে রাজসভাতে এসে সাক্ষ্য দিল।

- ‘রাজপুত্রেরা সত্যি কথাই বলেছেন, আমরাও দেখেছি। লব-কুশ দুজনেই লাল রংয়ের ডিউস্বলের পিছুপিছু বিবরে প্রবেশ করেছেন। আর নিজস্ব হননি। বিবরেও তাঁরা নেই।’

রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন এ তাহলে মা বসুমতীর কারসাজি।

তখন মন্ত্রীসভা ডেকে পরামর্শ চাইলেন রাম।

- ‘দূত পাঠান হক। বসুমতী মাতার কাছে সবিনয়ে রামচন্দ্র তাঁর পুত্রদের ফেরত চান। বলুন, যৌবরাজ্য ঘোষণার দিন এসে যাচ্ছে। বসুমতী নিশ্চয়ই ছেলেদের আটকে রাখবেন না।’

কিন্তু পাতালরাজ্যে যাবে কে?

দূতেরা কেউই নাগরাজ্যে যেতে রাজী নয়। ও বাবা! সাপের রাজ্যে কে যাবে? অগত্যা রাম সুমন্ত্রকেই বললেন।

কিন্তু রথ তো বিবরে প্রবেশ করবে না। সুমন্ত্র বুদ্ধি দিলেন - ‘মহারাজ! সর্বত্রগামী কেবল একজনই। তিনি পবনপুত্র মহাবলী হনুমান। আপনি তাঁকেই অনুরোধ করে দেখুন।’

হনুমান তো এককথায় রাজি। ল্যাজ খাড়া করে রেডি। মুহূর্তের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ক্ষুদ্র বিবরে প্রবেশ করে পাতালরাজ্যের স্বর্ণতোরণের দরজার সামনে হাজির।

কিন্তু বসুমতীও চরের মুখে সংবাদ পেয়ে, তোরণ বন্ধ করে দিয়ে, নিজেই গিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন। হনুমান এবার পড়লেন মহা মুস্কিলে। এ তো আর লঙ্কাদেবীর কেস নয়। ইনি সসাগরা বসুন্ধরা। সীতার মা। রামের শাশুড়ি। ঐকে থাবড়া মারার কথা চিন্তাই করা যায় না। হনুমান সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে প্রণাম করলেন বসুমতীকে। তাঁর শ্রীচরণে রামচন্দ্রের পাঠান উপটৌকন, হীরামণিক্যের মালাটি নিবেদন করলেন। আশীর্বাদ করে বসুমতী বললেন - ‘থাক্, থাক্। বল, শুনি, কি বার্তা এনেছ বাছা।’ হনুমান করযোড়ে নিবেদন করলেন রামচন্দ্রের যা কিছু বক্তব্য। সীতাকে ফিরিয়ে নিতেই এসেছেন। সীতার বিহনে রামচন্দ্র সবিশেষ দুঃখিত রয়েছেন। বড্ড একাকী হয়ে রয়েছেন। উপযুক্ত কথা বলার মত সঙ্গী নেই। তাছাড়া বাচ্চাদেরও কষ্ট হচ্ছে। মা না হলে কি শিশুর লালনপালন অন্যে পারে?

বসুমতী আবার হাসলেন। বললেন - ‘বুঝেছি। সীতার মতামতটাও তো চাই? তিনি ব্রতেশ্বরীর মন্দিরে দেবীর মূর্তির অভ্যন্তরে বসবাস করেন। কারুর সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ করেন না আর।’

হনুমান বললেন - ‘দেবী, তবে আমাকে সেই মন্দিরেই নিয়ে চলুন, সীতামায়ী আমার জননী। আমি তাঁর পুত্র।’ বলে গলায় সীতার আশীর্বাদী চন্দ্রমণির হারটি দেখালেন।

হার দেখেও বসুমতী বললেন - ‘বুঝলাম। কিন্তু বাছা, আমি তো তোমাকে কখনও দেখিনি। আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারলুম না। আমাকে

মার্জনা কর।’ বলে তিনি তোরণদ্বার বন্ধ করে দিলেন। হনুমান তো অঁঠে জলে। এবার? তিনি রাজপথের ধারে একটি বৃক্ষে বসে রইলেন। হঠাৎ দেখেন একদল ছোট মেয়ে গেটটি খুলে ভিতরে ঢুকছে। তারা কলসিতে করে পাতালগঙ্গার জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ব্রতেশ্বরীর মন্দিরে। এক বৃদ্ধা একটু পিছিয়ে পড়েছেন। হনুমান সন্ন্যাসীর রূপ ধরে গাছ থেকে নেমে এসে বৃদ্ধাকে বললেন - ‘মা, আপনি যখন মন্দিরে জল ঢালবেন, আমার এই আংটিটি তখন মায়ের পায়ে দয়া করে নিবেদন করবেন কি’? বৃদ্ধা তাতে রাজী হয়ে আংটি নিয়ে গেলেন।

সীতাদেবী ব্রতেশ্বরী হয়ে ভক্তদের পূজো নিচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন পায়ের ওপর পড়েছে রামচন্দ্রের মোহর দেওয়া অঙ্গুরীয়। সীতার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন - ‘এ আংটি তুমি কোথায় পেলে?’

বৃদ্ধা জানালেন, তোরণের বাইরে এক গাছ থেকে নেমে এসে এক সন্ন্যাসী তাঁকে এই আংটিটা দিয়েছেন পূজোতে দেওয়ার জন্যে। শুনেই সীতা ছুটে এলেন প্রাসাদে। বসুমতী বড়ি দিচ্ছিলেন। চমৎকার রোদ।

- ‘মা, মাগো। মহাবীর হনুমান তোরণদ্বারে এসেছেন, তাঁকে ভিতরে নিয়ে এস। তিনি আমার পুত্রতুল্য, অতি আপনজন।’

- ‘পুত্রতুল্যই তো, পুত্র তো নয়। আমি ভাল বুঝেছি বলেই তাকে ঢুকতে দিইনি। মুখে, সে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, প্রকৃতপক্ষে তার হচ্ছে লব-কুশকে হাতানো। তোমার এতে আপত্তি না থাকে তো বল, আমি তাকে ডেকে আনছি।’ সীতা স্নানমুখে বললেন - ‘না মা, তবে থাক্।’ তোরণদ্বার খুলল না। হনুমান বুঝলেন তাঁর দৌত্য অসফল। অগত্যা তিনি ভগ্নহৃদয়ে রামের কাছে ফিরে গেলেন।

মহাবীর হনুমান যে কোন কাজে অসফল হতে পারেন, এ রামের অকল্পনীয়। কিন্তু এ ব্যর্থতার কারণ আলাদা। হনুমান তো মোটে বলপ্রয়োগও করেননি, কৌশলও করেননি। সীতামায়ীর তিনি সন্তানতুল্য। সেখানে এসবের কোন প্রশ্নই নেই। হার-জিতেরও প্রশ্ন নেই। কী হবে তবে? লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন রামচন্দ্র।

লক্ষ্মণ বললেন - ‘ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন। কিন্তু হনুমান যখন পারেননি, আমি কি পারব? হাইলি আনলাইকলি। প্রথম কথা, আমি গর্তে ঢুকব কেমন করে? হনুমান বললেন - ‘সেটা কোন ব্যাপারই না। আমিই আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যাব। আমি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হলে আপনিও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হয়ে যাবেন। কুছ প্রলম্ন নেহি হ্যায়।’ তাই হল। হনুমানের ম্যাজিক অপ্রতিরোধ্য। এবার হনুমান আর লক্ষ্মণ দুজনে গিয়ে পাতাল-তোরণে কড়া নাড়লেন। এবারও দরজা খুললেন মা বসুমতী নিজে। দেবর লক্ষ্মণকে দেখে তাঁর আর না বলার উপায় রইল না। পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে দুজনকে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে। আদর করে বসালেন সাতপুরু রেশমী শয্যায়া। শীতল বাদাম-পেস্তার শরবৎ, ক্ষীর-কমলা, সাতরকমের মিষ্টান্ন সোনার থালায় পরিবেশন করে, খবর পাঠালেন সীতাকে।

সীতা এলেন।

- ‘এস ভাই লক্ষ্মণ, এস বৎস হনুমন্ত। তারপর, অযোধ্যার খবর কী? আর্থপুত্রের কুশল তো? মায়েরা কেমন আছেন? আমার বোনেরা ভাল তো?’

ভরত-শত্রুঘ্ন’?

প্রণাম করে হনুমান বললেন - ‘মা, আপনার আশীর্বাদে সকলেই কুশলে আছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের মন ভাল নেই। লব-কুশের কুশল তো?’
প্রণাম করে লক্ষ্মণ বললেন - ‘চলুন বৌদি, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। প্রজারা মহা গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আপনি না গেলে শান্ত হবে না।’
সীতা মৃদু হেসে বললেন - ‘অন্য কথা বল ভাই ঠাকুরপো। ও কথাটি বোল না।’

লক্ষ্মণ হনুমান দুই বীর, সীতার দুই প্রিয়জন, আপ্রাণ চেষ্টা করেও সীতাকে রাজী করাতে পারলেন না।

তখন লক্ষ্মণ লব-কুশকে দেখার অনুমতি চাইলেন। তারা তখন পাঠাগারে। লক্ষ্মণ জানলা দিয়ে দেখলেন দুই ভাই নিবিষ্টমনে পড়াশোনা করছে। মণিময় দীপের আলোয় তাদের মুখে মনোনিবেশের রেখাগুলি স্পষ্ট।

সেই দৃশ্য দেখে লক্ষ্মণের চোখ, মন ভরে গেল।

লক্ষ্মণের তাদের ধ্যানভঙ্গ করানোর ইচ্ছে হল না। এই বালকেরাই তো অযোধ্যানগরীতে প্রায় দুর্বৃত্ত হয়ে ওঠার পথে গিয়েছিল। এখানে ওদের চিত্তামগ্ন মূর্তি দেখে লক্ষ্মণ মোহিত হলেন। তিনি আর ওদের ডাকতে পারলেন না। পা টিপে টিপে চলে এলেন।

সাহস করে লক্ষ্মণ কি হনুমান কেউই গিয়ে সীতার কাছে লবকুশকে নিয়ে যাবার প্রসঙ্গটা পাড়তেই পারলেন না। সীতা বললেন - ‘আবার এমনি করে মাঝে মাঝে এস ঠাকুরপো, এস বাছা হনুমন্ত, তোমাদের বাক্য শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, মুখ দেখলে আয়ু বাড়ে। তোমাদের কল্যাণ হোক।’

অগত্যা, মুখ ফুটে বার্তা না বলতে পেরে বসুমতী আর সীতাকে প্রণাম করে দুই বীর শূন্য হাতে ফিরে এলেন। লক্ষ্মণকেও ব্যর্থকাম হয়ে ফিরতে দেখে রামচন্দ্র তো খাপ্পা! এদিকে প্রজাদের আর সামলে রাখা যাচ্ছে না। মরিয়া হয়ে রামচন্দ্র বললেন - ‘ঠিক আছে, হনুমানের সঙ্গে এবার আমিই যাচ্ছি। দেখি সীতা কেমন না আসেন?’ অহঙ্কারের মাথা খেয়ে, রাগ করে চলে যাওয়া বৌকে ফিরিয়ে আনতে এবার রাঘবকুলরত্ন রামচন্দ্র অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হয়ে নিজেই গেলেন হনুমানের পিঠে চড়ে পাতালরাজ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তোরণদ্বারের একশোটা সোনার ঘন্টা বাজতে লাগল। ভেরী, তুর্য, কাড়া, নাকাড়া সব নিনাদিত হল, বাসুকি, বসুমতী, লব-কুশ আর নাগরাজ্যের যত বাসিন্দা, সবাই যে যেখানে ছিলেন, ছুটে বেরিয়ে এলেন তোরণদ্বারে। নবদূর্বাদলশ্যাম রঘুপতি রাঘব রাজা রাম তাঁদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

অভ্যর্থনার অভাব হল না। লব-কুশ দৌড়ে এসে ‘বাবা!’ বলে প্রণাম করল হাসিমুখে। রাম বললেন - ‘দীর্ঘজীবী হও।’ মা বসুমতী এসে ধূপদীপ নিয়ে রামচন্দ্রকে বরণ করলেন। যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বসুমতী এগিয়ে এসে রামচন্দ্র ও হনুমানকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। লব-কুশকে দেখে মনে হল তারা বাবার থেকেও হনুমানকে দেখে অনেক বেশী খুশী। গতবারে তো দেখা হয়নি। তার আগের বারে তো ঢুকতেই পারেননি হনুমান। লব-কুশ হনুমানকে টানতে টানতে কুঞ্জবনে চলে গেল লাফাতে লাফাতে। হনুমান ছোটদের সঙ্গে খেলতে ওস্তাদ। রাজ্যসুদ্ধ সবাই এল, শুধু সীতাই এলেন

না। ব্রতেশ্বরী মন্দিরে খবর পাঠিয়ে, সোনার থালায় জামাই-আদর সাজিয়ে এনে বসুমতী দেখলেন গোমড়া মুখে রামচন্দ্র দক্ষিণের জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। আর বাসুকি বামের জানলা দিয়ে। কী ব্যাপার?

রামচন্দ্রের সামনে রাজভোগ, নাগভোগ, দেবভোগ ধরে দিতে দিতে বসুমতী বললেন - ‘কি হল? সীতা আসেনি?’ রামচন্দ্র মাথা দোলালেন। সীতা আসেননি। বসুমতী এবার আসল কথায় চলে এলেন। তিনি অধিক বাক্যের মানুষ নন।

- ‘তুমি কি লব-কুশকে নিয়ে যেতে এসেছ বাবাজীবন?’ হাঁ হাঁ করে উঠলেন রামচন্দ্র। বললেন - ‘আজ্ঞে, না, না, না। তিনজনকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। প্রজারা যে লাগাতার বন্ধ ডেকেছে। রামরাজ্য ছারখার হওয়ার পথে। অযোধ্যা তছনছ। ‘সীতা চাই! সীতা চাই!’ শ্লোগান দিচ্ছে। ‘লব-কুশকে ফেরৎ আন’, ‘যৌবরাজ্য ঘোষণা কর’, এইসব শ্লোগান তালপাতাতে লিখে ঝান্ডা তুলে শোভাযাত্রা করছে। এরপর হয়ত ‘রাজা রাম নিপাৎ যাক’-ও বলতে পারে। বড় দুর্বিপাকে পড়েই আপনার কাছে এসেছি দেবী।’

বসুমতী বাসুকির দিকে তাকালেন। বাসুকি বেরিয়ে গেলেন। বসুমতীর সঙ্গে রামচন্দ্রের কী কথা যে হল তা শুধু তাঁরাই জানেন। তার ঠিক পরেই হনুমানের দুই কাঁধে চড়ে আনন্দে ভাসতে ভাসতে দুই ভাই সেইখানে এসে পড়লেন। সবাই মিলে গল্প শুরু হল।

সীতা এলেন না।

সেদিন রাতে আকাশে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। বাতাসে ফাঙ্কুন। নাগকেশরের সুবাসে পাতালরাজ্য মাতাল।

সীতার দোরে টোকা পড়ল।

- ‘আমি রাম! দরজা খোল।’

দরজা খুলল না।

একটু ইতস্ততঃ করে গলা-টলা ঝেড়ে নিয়ে রামচন্দ্র আবার বললেন - ‘একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে। খুব জরুরি, দরজা খোল।’

দরজা খুলল না।

উলটে ভিতরের দীপটিও নিবে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা রামচন্দ্র এসে বসুমতীকে প্রণাম করে সীতা আর লব-কুশকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

বসুমতী বললেন - ‘বাবাজীবন! আমি নাচার। তোমার প্রার্থনার শুধু আধখানাই আমি পূরণ করতে পারি। বাকি আধখানা পারব না। সীতা স্বাধীন মেয়ে। তার নিজের বোধবুদ্ধি মতন চলে। এখানে ব্রতেশ্বরীর মন্দিরে বহু সম্মান পেয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে সে আছে। ভক্তদের এত আদর, ভালবাসা, এত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ছেড়ে সে কেমন করে চলে যাবে? আর সে কেনই বা যাবে? সে তো তোমার কাছে এমন প্রতিষ্ঠা পায়নি। সীতাকে তুমি আর অযোধ্যায় ফেরৎ পাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বালক যুবরাজদের কথা আলাদা। তাদের প্রাপ্য সিংহাসন থেকে তাদের আমরা বঞ্চিত করব না। তুমি লব-কুশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার, যদি আমার দুটি শর্ত মান। তা নইলে নয়।’

- ‘শর্ত দুটি কি কি’? - রাম সাবধানে জিজ্ঞেস করলেন।

- ‘প্রথম শর্ত, হনুমানকে ওদের সর্বক্ষণের গার্জেন করে দিতে হবে। তোমার অযত্নে, অবহেলায় ওরা নষ্ট হবার পথে যাচ্ছিল। তেমন দেখলে আবার নিয়ে আসব, আর ছাড়ব না। তবে, হনুমানকে ভার দিলে ওরা আনন্দে থাকবে, যত্নে থাকবে। সুশিক্ষা পাবে। আর দ্বিতীয় শর্ত, প্রতি বৈশ্যপতিবার ব্রতেশ্বরীর মন্দির সাফসুতরো করার জন্যে বন্ধ থাকে। তাই ঐ দিনটি হয়ে যায় সীতামায়ের মন খারাপ করার দিন। শর্ত এই যে, সপ্তাহে ঐ একটা দিন লব-কুশকে ছুটি দিতে হবে। ওরা সেদিন বেড়াতে আসবে পাতালরাজ্যে, ওদের মায়ের কোলে খেলা করবে। তা নইলে সীতার মন ভাল থাকবে না। কী, রাজী?’

একটু থেমে বসুমতী এবার হাঙ্কা গলায় জুড়ে দিলেন - ‘ইচ্ছে করলে অবিশ্যি ওদের বাবাও হুগায় হুগায় আসতে পারেন, কিন্তু মাঝে মধ্যে। তাতে কোন বাধা নেই।’

শোনবামাত্র আতলাদে আটশোখানা হয়ে মহাবীর হনুমান একটি বিপুল লাফ দিয়ে ‘হুউপ্’ করে ঘরের মণিময় স্তম্ভের মাথায় উঠে পড়লেন। পরমুহূর্তেই আর একটি ঝাঁপ মেরে ‘ঝুউপ্’ করে মর্মর মেঝের ওপর পড়ে গেলেন। রামচন্দ্র সেই দৃশ্য দেখে মৃদু হেসে বললেন - ‘আমি রাজী।’

সঙ্গে সঙ্গে ব্রতেশ্বরীর মন্দিরের উঠানে নাগকেশর ফুলের রাশ ঝড়ে পড়ল, আর মর্ত্যভূমি মেতে উঠল তার সৌরভে। ❀

সরলাদেবীর ‘কামিং টু অ্যামেরিকা’

রক্তিম সেন

‘কামিং’

ছেঁট নাতি কাবলুর হাত ধরে সরলাদেবী অ্যাটল্যান্টার হার্টস্ফিল্ড এয়ারপোর্টের বাইরে হতবাক দৃষ্টিতে যানবাহনের ব্যস্ততা দেখছেন। পাশে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলে নিতুর বৌ মিতালি - বনানীর সঙ্গে কথা বলছে। সরলাদেবী বনানীর সঙ্গেই কলকাতা থেকে এসেছেন। মেয়েটি বড় ভাল। দু’ দিন আগে যাকে চিনতেনই না, সেই কেমন আপন করে এতটা পথ আগলে নিয়ে এসেছে। খাওয়া-দাওয়া, বাথরুম দেখিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে, এক প্লেন থেকে অন্য প্লেন ধরা, পাসপোর্ট, টিকিট, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস্ - সব বনানীই সামলেছে। ওর স্বামী প্রদীপ ও নিতু গাড়ি আনতে গেছে পার্কিং লটে।

এরই নাম অ্যামেরিকা! আজ প্রায় বছর খানেক ধরে সকলেই সরলাদেবীকে রাজি করানোর চেষ্টা করেছে অ্যামেরিকায় ছোট ছেলের কাছে দু-তিন মাস বেড়িয়ে আসার জন্য। কিছুতেই রাজি করাতে পারছিল না কেউ। বেশি জোর করলেই বলেন, - অনেক দূর। আমার শরীরে দেবে না। অবশেষে কাবলুর কথা ফেলতে পারলেন না। কাবলুর এক কথা, - ঠাম্মা, তুমি না এলে, আমিও আর যাব না। মা-বাবা দেশে গেলেও না।

তারপর আর কি? কাবলুদের সঙ্গে ফোনে কথা বলা শেষ হওয়া মাত্র বড় ছেলে গৌরের বাড়ি ফোন করলেন। ওর ছেলে বাবলু ফোন তুলেছিল। সরলাদেবী ওকেই বললেন, - আমি কাবলুদের কাছে বেড়াতে যাচ্ছি! ব্যস! যেই না বলা, বাবলু চিৎকার করতে আরম্ভ করেছিল, - মা, মা, ঠাম্মা অ্যামেরিকা যাচ্ছে - ঠাম্মা অ্যামেরিকা যাচ্ছে! বড় বৌমা রত্নার গলা শোনা যায়, - কি পাগলের মত চিৎকার করছিস? বাবলু ওর মাকে ফোনটা দিয়ে বলল, - তুমি ঠাম্মার সঙ্গে কথা বলে নাও তারপর আমি কাবলুকে ফোন করব। ওর সাথে কথা বলতে হবে।

রত্না স্বাশুড়ির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে বলল, - আমি এক্ষুণি আসছি। দিদিরা জানে?

সরলাদেবী উত্তর দেন, - তোমাদেরই প্রথমে ফোন করলাম।

ওদিকে ততক্ষণে বাবলু ফোন কেড়ে নিয়েছে মায়ের কাছ থেকে। - ঠাম্মা, তুমি একদম চিন্তা কোর না। আমরা তোমাকে অ্যামেরিকা সম্বন্ধে সব শিখিয়ে দেব। রত্না ফোনটা আবার কেড়ে নেয়। - যা, যা, বড় ওস্তাদ এসেছে অ্যামেরিকা! তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। আর দেখ বিশু কোথায় গেছে। ওকে গাড়ি বার করতে বল। ঠাম্মার বাড়ি যাব। তারপর স্বাশুড়িকে বলে, -

মা, আমরা তোমার ওখানে চলে আসছি। তুমি দিদির সঙ্গে কথা বলে নাও। আমি একটু পরে ওদের ফোন করছি। ওরা যদি যেতে চায়, যাবার পথে ওদেরও তুলে নেব।

সরলাদেবী রত্নাকে বললেন, - তা হলে এখানেই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া কোর। আমি সুমিকেও তাই বলছি। নয়নাকে নিয়ে যেন এখান চলে আসে।

ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই সরলাদেবীর বেহালার বাড়ি গমগম করতে আরম্ভ করল। প্রথমে রত্না, সুমিতা, বাবলু ও নয়না। তারপর গৌর এবং জামাই বিকাশ। বিকাশ এসেই বলল, - মা, একবার কাবলুদের ফোন করে নিতুর থেকে জানা দরকার আমাদের কী কী করণীয়। সরলাদেবী বললেন, - মিতা বলেছে পাসপোর্টটা আগে করাতো। তারপর ভিসার জন্য যা কাগজ পত্র লাগবে সব ওরা পাঠিয়ে দেবে। গৌর অভয় দিয়ে বলল, - পাসপোর্ট হয়ে যাবে। আমি সোমবারে আমাদের অফিসের ড্র্যাভেল এজেন্টকে লাগিয়ে দেব। কাল রত্নার সঙ্গে গিয়ে কয়েকটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি তুলে এনো। নয়না পাশের থেকে ফোড়ন কাটল, - ছোটমামা কতবার বলেছে, পাসপোর্টটা অন্তত করিয়ে রাখ।

বিকাশ পাসপোর্ট করা নিয়ে চিন্তিত নয়। তাই বলে, - পাসপোর্ট হয়ে যাবে। আর কি কি লাগবে তা জানা দরকার। বাবলু, এখন অ্যামেরিকায় কটা বাজে রে? এখন ফোন করা যাবে?

সরলাদেবী বললেন, - এখন ওখানে মাঝরাত হবে। মিতা তো সব সময় সকালে যখন ফোন করে, সকাল আটটার মধ্যেই করে। আর রাতে করলে সাড়ে দশটার মধ্যে।

বিকাশ এখনই ফোন করতে চায়। - এই কাবলু, অ্যামেরিকার সঙ্গে আমাদের টাইম-ডিফারেন্স কত রে?

বাবলুর জেনারেল নলেজের ওপর অনেকেই নির্ভরশীল। বাবলু, বয়সের তুলনায় অনেকটা বেশি গাষ্ঠীর্ষ এনে বলল, - অ্যামেরিকায় কটা টাইম জোন জান? কাবলুরা তো রস্‌ওয়েলে থাকে। রস্‌ওয়েল মনে হয় ওয়েস্টে। তাহলে আমাদের সঙ্গে সাড়ে তেরো ... না, এখন তো সামার। সাড়ে বারো ঘন্টা পিছিয়ে। এখন ওখানে মাঝ রাত্তির।

নয়না ভাই-বোনদের মধ্যে সব চেয়ে বড় হলেও ওর কথা কেউ খুব একটা পান্ডা দেয় না। মিনমিনে গলায় বলল, - তবে যে কাবলুরা বলে ওরা অ্যাটল্যান্টায় থাকে।

বাবলু ছাড়ার পাত্র নয়। উত্তর দেয়, - কাকুদের ঠিকানাটা দেখেছিস - রস্‌ওয়েল।

বিকাশ মধ্যস্থতা করার জন্য শ্বাশুড়ির কাছে নিতুদের ঠিকানাটা দেখতে চাইল। তারপর ঠিকানার পাতায় চোখ বুলিয়ে বলল, - রস্‌ওয়েল, জি এ ৩০০৭৬; অ্যাটল্যান্টার নামগন্ধও নেই। তারপর মেয়েকে চুপ করানোর জন্য বলল, - নিজের মামা কোথায় থাকে তাও জানিস না? নয়না তার স্বভাবগত মিহি বলায় বলল, - তুমিও তো জানতে না তোমার শালা কোথায় থাকে!

- ঠিক আছে, ঠিক আছে। সন্ধ্যা সাত নাগাদ ফোন করব। আজ নয় ওদের ঘুম ভাঙাব।

সন্ধ্যা হতে না হতেই বাবলু ঘড়ি দেখে বলল, - কাবলুদের ফোন করবে না? বিকাশ বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নাম্বারটা কত? মা, আপনার ফোনে কি আই এস ডি লক্ করা? বাবলু বলল, - না, আমি জানি লক্ করা না। বাবলুই নাম্বার ডায়াল

করল। বাবলু এবার ফিস্ ফিস্ করে বলে, - এই চুপ, চুপ, রিং হচ্ছে! ও পাশে মিতা ফোন ধরে। বাবলু গলার আওয়াজ চড়িয়ে বলে, - মণিমা, আমি বাবলু। তোমাদের ওখানে এখন কটা বাজে? মিতা বলে, - এখন প্রায় সাড়ে নটা বাজে। কেন রে? বাবলু কেমন চুপসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, - তোমরা ওয়েস্টে থাক না? আমি তো ভাবলাম এখন ভোর সাড়ে ছটা। - নারে, অ্যাটল্যান্টা তো ইস্টার্ন টাইমে। - তোমরা অ্যাটল্যান্টায় থাক? ঠিকানায় তো রস্‌ওয়েল লেখা। রস্‌ওয়েল তো ওয়েস্টে। সব ইউ-এফ-ও-দের আড্ডা ওখানে। - সে রস্‌ওয়েল তো নিউ মেক্সিকোতে! আমরা থাকি অ্যাটল্যান্টার একটা সাবার্বে।

নয়না বুঝল, এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। - এই যে ওস্তাদ। ছোটমামী কি বলল? ওরা অ্যাটল্যান্টায় থাকে, তাই না? বাবলু গলা নামিয়ে বলল, - ঠিকানাটা উল্টোপাল্টা হলে আমি কি করব? আমি কি করে জানব যে ওরা একগাদা শহরের নাম রস্‌ওয়েল দিয়ে রাখবে?

- মা, চল, ও গাড়ি নিয়ে এসে গেছে। মিতার কথায় চমক ভাঙল। গাড়ি কি - এতো মিনিবাস! সরলাদেবী ফিস্‌ফিস্ করে নাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, - হাঁরে কাবলু, তোর বাবা কি এই মিনিবাসটা চালায় নাকি?

কাবলু ঠাম্মাকে অনেকদিন বাদে দেখছে। একটু হেসে বলল, - ঠাম্মা, এটা মিনিবাস না - মিনিভ্যান্। মা'র গাড়ি।

সরলাদেবী কথাটা শুনে হকচকিয়ে গেলেন। এই টাউশ গাড়িটা বৌমা চালায়! বলে কি? এদের কি ভয়ডর বলতে কিছু নেই?

ঠাম্মাকে সীটে বসিয়ে, সযত্নে সীট-বেল্ট বেঁধে দিতে দিতে কাবলু বলল, - ঠাম্মা, সীট-বেল্ট খুলবে না কিন্তু। তা হলে পুলিশ ধরবে আর বাবাকে ফাইন্ করবে।

গাড়িতে যেতে যেতে মাকে অ্যাটল্যান্টা শহরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল নিতু। কিছুক্ষণ পরে আর চেপে থাকতে না পেরে ছেলেকে বললেন, - নিতু, তুই বৌমার জন্য একটা ড্রাইভার রেখে দিস না কেন? এই মিনিবাসের মত গাড়ি চালানার কি দরকার? গৌর তো রত্নার জন্য ড্রাইভার রেখে দিয়েছে। বিশু তো নামেই গৌরের ড্রাইভার। আসলে তো ও বাড়িতেই ডিউটি দেয়। নিতু অল্প হেসে বলল, - দেশের কথা আলাদা। এখানে কোম্পানীর বড় সাহেবও নিজে গাড়ি চালিয়ে আসে।

মিনিট চল্লিশেকের মধ্যে নিতুদের বাড়ি পৌঁছে গেলেন সরলাদেবী। বেশ খানিকটা জমি নিয়ে নিতুদের বাড়ি। খুবই ছিমছাম, গোছানো। মিতা এসেই চা বসিয়ে দিয়েছিল। - মা, তুমি চা খেয়ে স্নান করে নাও। তারপর তাড়াতাড়ি ডিনার করে নেব।

সরলাদেবী তখন কলকাতায় পৌঁছ-সংবাদটা দিতে চান। - হ্যাঁ বৌমা, কলকাতায় এখন ফোন করা যাবে?

- একটু পরে করি? এখন তো অনেক রাত ওখানে।

- তা হোক। তুমি রত্নাকে ফোন করে বলে দাও। ওরা চিন্তায় থাকবে।

‘স্টেইং’

সরলাদেবী অ্যামেরিকায় আসার আগে বাবলু থেকে শুরু করে সকলেই কিছু না কিছু তথ্য সরবরাহ করেছে। রাস্তার ডান দিক দিয়ে গাড়ি চলে এখানে

তা অনেকের মুখে অনেকবার করে শুনেছেন। রাস্তা পার হবার সময় কোন দিকে আগে তাকাতে হবে বাবলু পাখিপড়া পড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে অনেক কিছুই যেন অন্য রকম। বাথরুমে লাইট জ্বালাতে গিয়ে দেখেন লাইটের সুইচগুলো উল্টো। কাবলুকে ডেকে সে কথা বললেন সরলাদেবী। বাবলু তো প্রথমে বুঝতেই পারেনি। - সুইচ কেন উল্টো হবে? এই তো ওপরে করলে অন্ আর নিচে করলে অফ্। সরলাদেবী অবাক হয়ে বললেন, - নিচে করলে অফ্? এ তো কখনও শুনি নি।

লাইটের সুইচ দিয়ে শুরু। চায়ের সঙ্গে 'কুকি' খাবে কিনা নাতি এসে জিজ্ঞাসা করল। - কুকি? জানি না। কোনদিন খাই নি তো! দেখাও তো একটা। দেখি কেমন?

- তুমি কুকি খাওনি হতেই পারে না। কাবলু বিশ্বাসই করতে পারছে না। তারপর একটা চকলেট্ চিপ্ কুকি এনে ঠাম্মাকে দেয়।

- একে তোমরা কুকি বল? আমরা দেশে বিস্কুট বলি।

- বি-স্কুট? বি-স্কুট কি?

মিতা রান্না করতে করতে ছেলেকে মৃদু ধমক দিল। - তোরা বলিস বিস্কিট্, আমরা বলি বিস্কুট।

কাবলু বলে, - ঠাম্মা, বি-স্কুট তো ব্রেড্-এর মত খেতে। তোমাকে ম্যাকডোনাল্ড্-এ নিয়ে গিয়ে একদিন খাইয়ে আনব।

মিতা রান্নাঘর থেকে বলল, - ঠাম্মা চিকেন্ খায় না। চিকেন্ বিস্কুট খাবে না। তারপর স্বাশুড়িকে বলল, - ও আমাদের বান্ রুটির মত অনেকটা।

কথা বলতে বলতে সরলাদেবী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জেট্ ল্যাগ্ কাটতে সময় লাগবে। কাবলুর ডাকে ঘুম ভাঙে। মনে হল ও সব স্নান করে এসেছে। নাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, - সকালে স্নান করনি?

- আমি তো সকালে স্নান করি না। বিকেলে করি।

- কেন রে? সকালে স্নান করলে মাথা দেখবি কেমন ফ্রেশ্ লাগবে। ঘুম কেটে যাবে।

- তুমি মাকে বল। কাবলু ঠাম্মাকে বলেছিল।

নিতু কিছুক্ষণ কমপিউটারে বসেছিল। বলল ই-মেইল্ দেখছে। মিতা ওকে বলল, - একবার ওয়ালমার্টে যাবে নাকি? আমি দুধটা কিনতে ভুলে গিয়েছি। একটা টু-পার্সেন্ট নিয়ে এস।

- আর কিছু লাগবে?

- না। ও, হ্যাঁ ... একটা রোববারের কাগজ নিও।

রোববারের কাগজ? ভুল শুনলেন নাকি? আজ তো শনিবার? ভুল শুনেছেন বোধহয়।

নিতু ফিরে এল আধ ঘন্টার মধ্যে। হাতে দুধ আর খবরের কাগজ। হ্যাঁ - রবিবারের কাগজ! সরলাদেবীর কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে মনে হল। ভাবলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিকই। তা এখন কি সকাল? তার মানে কি আজ রবিবার?

ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, - হ্যাঁরে নিতু, আজ কি বার রে?

- কেন? শনিবার।

- তা তুই রবিবারের কাগজ কোথায় পেলি? ও কি আগের রবিবারের?

- না মা। এখানে রবিবারের কাগজ শনিবারে পাওয়া যায়।

- একদিন পরের খবর ছাপায় কি করে রে?

- মা, এখানে রবিবারের খবরের কাগজ বেশীর ভাগ লোকে কেনে কুপনের জন্যে। মিতা কুপনের ব্যাপারে ওস্তাদ।

মিতা হেসে উত্তর দিল, - যা হচ্ছে বল। কিছু না হলেও প্রতি সপ্তাহে দশ-পনের ডলার বাঁচাই কুপন দিয়ে। কোনদিন তো অ্যাপ্রিশিয়েট্ করলে না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মিতাই বাসন মাজল। রান্নাঘর পরিষ্কার করল। নিতু ও কাবলু ফুট্-ফরমাস্ খাটছিল। সরলাদেবীর চুপচাপ বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছিল। মিতা তারপর বসার ঘরে এসে সবার সঙ্গে বসল। টিভি চালিয়ে জিজ্ঞাসা করল, - দেশের প্রোগ্রাম্ দেখবে নাকি?

- না এখন থাক। গল্প করি বরং।

কথাবার্তার মধ্যেই বেশ কয়েকটা ফোন্ এল। বোঝাই গেল এরা সব নিতুদের স্থানীয় বন্ধুবান্ধব। খবর নিচ্ছে সরলাদেবীর। কেউ কেউ আবার নেমন্তন্ন করছে। এর মধ্যে কাবলুর একটা ফোন্ এল। মিতাই ধরেছিল। - কাবলু, কোচ্ ব্রাউন্। ফোন্ ধর।

কোচ্ ব্রাউন্? এখানেও কি দেশের মত কোচিং ক্লাসের ঘটনা? বাবলু-নয়নার দিকে তাকানো যায়? স্কুল্ থেকে ফিরতে না ফিরতেই একটার পর একটা কোচিং ক্লাস্। আজকাল কলকাতার স্কুলে মনে হয় পড়াশোনা উঠে গেছে। সরলাদেবীর ছেলেমেয়েরা তো কোনদিন প্রাইভেট্ টিউটরের কাছে পড়েনি। পড়বার দরকারও হয়নি। মিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, - কলকাতার মত এখানেও কি কোচিং ক্লাসের ঘটনা?

- না না, এখানে ও সব চলে না। ওর বাস্কেটবল্ খেলার কোচ্ ফোন্ করেছে।

কাবলু কথা বলে এসে এক ফাঁকে টিভির চ্যানেল্ চেঞ্জ করে একটু খেলা দেখে নিল।

সরলাদেবী নাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, - কি খেলারে এটা?

- ফুটবল্।

- ফুটবল্?

- এত মারামারি করে ফুটবল্ খেলে নাকি?

- ঠাম্মা, এটা অ্যামেরিকান্ ফুটবল্। ওরা মারামারি করছে না। ওটাকে ট্যাকল্ বলে। তুমি সকারের কথা ভাবছ।

- ওই হল। আমরা সকার-টকার বলি না। ফুটবল্ বলি। ইস্টবেঙ্গল্, মোহনবাগান - খুব নাম করা টিম্। তা তুমি এসব মারামারি খেলা খেল নাকি?

- আমি বাস্কেটবল্ খেলি। মা কিছুতেই ফুটবল্ খেলতে দেয়না।

- মা ঠিকই বলে। মা'র কথা শুনবে। ও সব মারামারির খেলা না খেলাই ভাল।

সরলাদেবী অ্যামেরিকায় এসেছেন প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে। এখন জেট্-ল্যাগ্ আর নেই। সারাদিন শুয়ে বসে সময় আর কাটেনা। নাতির গরমের ছুটি তাই রক্ষে। রাতে একটু চিন্তাই হয়। কলকাতায় আজকাল বড় বেশি

চুরি-ডাকাতি বেড়েছে। আসার আগে কোলাপ্সবল্ গেট্ লাগিয়েছেন বড় দরজায়। তবু চিন্তা হয়। এখানকার জন্যও চিন্তা হয়। এখানকার বাড়িগুলোর দেয়ালগুলো যা পলকা। তার ওপরে জানলাগুলোও কাঁচের। নিতুকে সে কথা বলতে নিতু মুচুকি হেসে বলল, - চিন্তা কোরনা, ইন্সিওরেন্স আছে।

আজ শনিবার। সবাই হাতের কাজ সারছে। সরলাদেবীর স্নানাদি ও পূজো হয়ে গেছে। মিতা থ্রোসারি শপিং করতে গেছে। ও বেরোনের আগে বলে গিয়েছে যে মাইক্রোওয়েভে বাটিতে দুধ রাখা আছে। নিতু যেন এক মিনিট গরম করে দেয়। নিতুকে দু-চার বার ডাকতে কাবলু উঠে এসে বলল, - ঠান্মা, বাবা বাইরে ঘাস কাটছে।

সরলাদেবী কথাটা শুনে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। - ঘাস? তোদের আবার ঘোড়া আছে নাকি?

- আরে দূর! ঘোড়া থাকবে কেন? বাবা বাইরে লনে আছে। ডেকে দেব?

- না থাক। তুই আমাকে দুখটা গরম করে দে তো।

কয়েকদিন ধরে নিতুকে বলব বলব ভাবছিলেন সরলাদেবী। একটা কাজের লোক রাখলেই তো পারে। মিতার সারাদিনে এতটুকু অবসর নেই। মেয়েটা এত ভাল নাচ করত। কোথায় নাচ প্র্যাক্টিস্ করবে - তা না! বাজার করছে, রান্না করছে, বাসন মাজছে, ঘর পরিষ্কার করছে, বাথরুম পরিষ্কার করছে! আর নিতু? সে বাইরে ঘাস কাটছে? এর জন্যেই কি এত পড়াশোনা শিখিয়েছে বাবা-মা? এখানকার ব্যাপার-সাপার সব অদ্ভুত!

বিকেলে আবার নেমস্তম্ভ। কোন কারণ নেই - এমনই। প্রথমে পার্টি কথাটা শুনে একটু পিছিয়ে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন এলাহি ব্যাপার। প্রত্যেকটি পরিবারই একটা গিফ্ট্ ব্যাগ্ ঢোকান মুখে এক কোনে রেখে দিচ্ছে। সরলাদেবী ভাবছেন, - তবে যে বলল নিমন্ত্রণের কোন কারণ নেই! কি জানি, কি ব্যাপার?

প্রায় দশ-বারোটি পরিবার এল। দেখে ভাল লাগল, বৌয়েরা সকলেই ভারতীয় পোষাক পরা। বেশির ভাগই শাড়ি। কেউ কেউ সালোয়ার কামিজ। ছেলেরা একদিকের ঘরে বসল, প্রায় প্রত্যেকের হাতেই বিয়ারের বোতল। যস্মিন্ দেশে যদাচার! সামনে টিভি চলছে। খেলা দেখাচ্ছে। এরা আবার ক্রিকেট্ খেলে না - বেসবল্ খেলে। কেউ খেলা দেখছে বলে মনে হল না। ছেলেদের গলার আওয়াজে মনে হল রাজনীতি নিয়ে কথা বলছে। মেয়েরা অন্য ঘরে বসে কলকাতার মতই পরনিন্দা-পরচর্চায় মেতে উঠল। মাঝে মাঝে হিন্দি সিনেমা কবে কি রিলিজ করছে সে সংবাদ আদান-প্রদান। একেবার কচি-কাঁচারা নিজেদের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করছে। আর একটু বড়রা একটা ঘরে বসে ভিডিও গেম্ খেলছে।

সরলাদেবী নিরামিষ খান, তাই তাঁর জন্য নানা রকম তরি-তরকারি। কে বলবে এটা কলকাতা না? সুত্ত, বেগুন থেকে শুরু করে দই-মিষ্টি। মাছ-মাংস তো আছেই! বাড়িতেই বানানো সব। নাং, বৌগুলোর গুণ আছে। সারা দিন এত কাজ করার পরেও সময় পায় কি করে এত রান্না করার?

দেখতে দেখতে চার মাস কেটে গেছে। ইতিমধ্যে নিতুরা নায়াগ্রা ফল্‌স্, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন্ ডিসি দেখিয়ে এনেছে। গাড়ি করেই গেছেন। রাতে মোটোলে থেকেছেন সবাই মিলে। সকালে উঠে স্নান-ব্রেকফাস্ট্ করে আবার বেরিয়ে পড়েছেন গাড়িতে। নিতুরা যখন প্রথমে বেড়াতে যাবার কথা বলেছিল, সরলাদেবীর খুব একটা উৎসাহ ছিল না। অ্যাটল্যান্টায় একটা পাথরের চিপিকে এরা 'মাউন্টেন্' বলে - 'স্টোন্ মাউন্টেন্'; একটা ছোট

খালকে এরা 'রিভার' বলে - 'চাটাহ্চি রিভার'। একটা পুকুরের পারে বালি ঢেলে বলে নাকি বিচ্। গঙ্গা-হিমালয়ের দেশ থেকে এসে প্রহসন মনে হত। কিন্তু সে মনোভাব নায়াগ্রা-যাত্রাতেই কেটে গেছে।

দুর্গা পূজোর কটা দিন বেশ ভালই কাটল। শুক্র, শনি, রবি মিলিয়ে আড়াই দিনের পূজো। তিথির ধার ধারে বলে মনে হল না। তবে বিচিত্রানুষ্ঠান, ধুনুটি প্রতিযোগিতা, শাড়ি-গয়না-সিডির স্টল, ম্যাগাজিন্ - আয়োজনের ঞ্চি কিছু নেই। আর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারও বেশ এলাহি। এত বাঙালি আছে এখানে? মনে হল সবাই সারাদিনের জন্যে চলে আসে এবং রাতে বিচিত্রানুষ্ঠানের শেষে বাড়ি চলে যায়। নিতুরা অবশ্য কাছাকাছি একটা হোটেল্ নিয়েছিল। নিতু সকালে পূজোর ওখানে চলে যেত। বাকি সবাই দেরীতে।

ছোটরা বেশ সুন্দর একটা রূপকথা পরিবেশন করল - অনেক দিনের প্রস্তুতি বোঝাই গেল। বড়রা একটা নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। আর মেয়েরা একটা নৃত্যনাট্য। বেশ ভাল লাগল। কলকাতার পাড়ার পূজোয় এসব বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। যদি ছোট বাচ্চাগুলো একটু চূপ করে বসে অনুষ্ঠান দেখত, তা হলে আরও ভাল লাগত। বড্ড দৌড়োদৌড়ি করে। তা কি আর করা যাবে?

‘গোয়িং’

সকাল থেকেই থমথমে ভাব। সরলাদেবীর কলকাতায় ফিরে যাবার দিন এসে গেছে। বিকেলে পাঁচটা নাগাদ ফ্লাইট্। অ্যাটল্যান্টা থেকে প্যারী হয়ে দিল্লী, তারপর জেট্ এয়ারে কলকাতা। নিতুদের বন্ধু অনিমেঘ সপরিবারে কলকাতা যাচ্ছে। তাদের সঙ্গেই তিনি যাবেন।

কেন এমন হয়? পাঁচ মাস বাদে দেশে ফিরছেন। বাবলু ও নয়নারা ব্যস্ত হয়ে গেছে। এদিকে কাবলুর মুখের দিকে তাকানো যায় না। ও মুখে কিছু বলছে না কিন্তু বুক ভরা কান্না। কেন এমন হয়? এক প্রিয়পাত্রকে কাছে পেতে হলে কেন আর একজনকে ছেড়ে যেতে হয়? বিয়ের পর বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি ফিরে যাবার সময়ও ঠিক এমন ভাবেই হাসি-কান্নায় মন ভরে উঠত। কেন এমন হয়? কাউকে ছেড়ে যাবার কষ্ট; অন্য কাউকে ফিরে পাবার আনন্দ!

এয়ারপোর্টে কাবলু খুব কেঁদেছে। মিতা ও নিতুও চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। সরলাদেবীর চোখেও জল। মনে মনে ভেবেছেন, যে যেখানে থাকে সুখে থাক। শান্তিতে থাক। জীবনের পথ যাকে যেদিকে নিয়ে যাবে তাকে তো সেদিকেই যেতে হবে। ছোট পৃথিবীটা আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে, এটাই সত্যনা। সরলাদেবী জানেন, কলকাতা যেতে যেটুকু সময় পাবেন, তার মধ্যেই একদিকের কান্নটাকে চাপা দিয়ে অন্যদিকের জন্যে মুখে হাসি বার করে আনতে হবে। যতই কষ্ট হক। বাবলু-নয়নারা সকলেই যে দমদম এয়ারপোর্টে আসবে! ॥

ক্ষুরস্য ধারা

বীথি চক্রবর্তী

হান্টস্ভিল, অ্যালাবামা

বাচ্চাগুলো খেলছিল মাঠে। স্কুলের সংলগ্ন খেলার জায়গায় সবই আছে - দোলনা, slide, sandbox. মিনু বসেছিল কাছেই একটা টেবিলের কাছে। দৌড়াদৌড়ির কাজগুলো করছিল জুলি। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মেয়েটা বড় ভাল। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ মিনুর ওপর ওর বড় মায়া। ছোট্টাছুটির কাজগুলো জুলিই করে। মিনু ওর সতেজ তরুণ দেহের অনায়াস সুখ ছন্দে চলাফেরা, তৎপরতা মুগ্ধ চোখে দেখে আর ভাবে - ‘এক সময় আমিও পারতাম। এখন আর পারিনা।’

আজকের দিনটি ভারী সুন্দর। দেখে বোঝাবার উপায় নেই যে কত বড় বৃষ্টি হয়ে গেছে কাল রাতে। প্রসন্ন রোদের হাসিতে ঝলমলে দিন। প্রায় দশটা বাজল। মিনু উঠে দাঁড়াল। বাচ্চাদের এবার ক্লাসরুমে নিতে হবে। sandbox এ বাচ্চারা এত বালি মেখেছে যে তাদের প্রায় চেনা যাচ্ছে না। যেন দুই মাস আগে, ‘কাল আমি খুব রেগে গিয়ে খুব ভাস্কর করছিলাম - কই না’তো। এই তো দেখ আমি কি রকম শান্ত। কিন্তু বাচ্চারা একি করছে! সারাগায়ে এমন বালি মেখেছে?’

মিনু হেসে বলল, ‘চলো ওদের ঝেড়ে এবার যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে ক্লাসরুমে নিয়ে যাই। ওদের মায়েদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। পরিষ্কার করতে প্রাণ বেরোবে।’

জুলি বলল, ‘শুধু মায়েদের বলো না মিস মিনতি, বাবাদেরও বলো। আজকাল সব fifty fifty. মা যদি একবার diaper পাল্টায় ত’ পরের বার বাবাদের পালা। তবে আমাদের ওপরেও রাগ করবে। বলবে, এতগুলো টাকা নেয় অথচ বাচ্চাদের কিছু দেখেনা।’

মিনু সায় দিয়ে বলে, ‘তা ঠিক।’

ওরা বাচ্চাদের নিয়ে ক্লাসরুমে ঢুকল। ছোট ছোট ডেস্কের সঙ্গে লাগানো ছোট ছোট চেয়ার। সব বাচ্চাদের বসিয়েছে এমনসময় স্কুলের অধ্যক্ষ এসে মিনুকে ডাকল, ‘মিস মিনতি, একটু আমার ঘরে এসো।’

মিনু ভয়ে কঁপে উঠল। আজকাল দিনকাল ভাল না। অর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ যে যখন তখন চাকরি চলে যাচ্ছে। এই পনেরটা বাচ্চার অনেক বাবা অথবা মায়ের চাকরি নেই। এই স্কুলটা নামকরা montessori স্কুল হলেও মিনু শুনেছে এবার স্কুলের অনেক বাচ্চারাই আর পরের semester এ ক্লাসে আসবে না। মিনু আর থাকতে পারল না। অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করে বসল, ‘আমি কি কিছু ভুল করেছি?’

অধ্যক্ষ হাসলেন, ওর পিঠে হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বললেন, ‘তুমি বসো।’ একটু থেমে চশমার মধ্যে দিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার স্বামীর stroke হয়েছে। অফিসে বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কোন সহকর্মী

দেখতে 911 ডাকে। ওকে downtown এ হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তুমি বাড়ি যাও। তোমার মেয়ে আসছে তোমাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে। তোমার স্বামীর অফিস থেকে ফোন এসেছিল। আমি হাসপাতালের নাম ও ফোন নম্বর লিখে রেখেছি। এই নাও।’ অধ্যক্ষ শূন্য চোখে মিনুকে ওঁর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে ওর দু-কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, ‘মিস মিনতি, আজকাল technologyর এত উন্নতি হয়েছে যে stroke এর রোগী সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়। তুমি ভেব না।’

মিনুর সংসারটা ছোট। স্বামী আর দুই ছেলেমেয়ে। ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার, কাছেই একটা শহরে থাকে। মেয়েটি high school এ পড়ায়, ওদের সঙ্গেই আছে। মিনু পাথর হয়ে বসেছিল। মেয়ে এসে ডাকল, ‘মা।’

মিনু যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়াল। এর মধ্যে কখন অধ্যক্ষ ক্লাসরুমে গিয়ে মিনুর ব্যাগ ও অন্য জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিএলেন। সেগুলো মিনুর হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন, ‘সাহস রাখ মিনতি। আমি হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছি। His condition is stable.’

মিনু গাড়িতে এসে বসল। গাড়ি ছুটে চলেছে downtown এর দিকে। সারা রাত্তায় দুজনের কোনো কথা নেই। মৌ একবার বলল, ‘ভাইকে খবর দিয়েছি। ও বিকেলের মধ্যেই এসে যাবে।’

মিনু এবার বলল, ‘কখন হয়েছে?’

মৌ বলল, ‘সকাল সাড়ে নটা।’

মিনু জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। দু’দিকে গাড়ি ছুটে চলেছে। আলো ঝলমলে দিন, কোথাও কোন দুঃখ বা বিপদের আভাসমাত্র নেই। তবু এমনদিনেও কত লোক তাঁর আপনজনদের কাঁদিয়ে চলে যাচ্ছে। কত ছোট ছোট শিশু এসেছে এ পৃথিবীতে। নিজে কঁদে হাসিয়েছে পরিজনদের। হাসপাতালে এসে পৌঁছাল ওরা। সবচেয়ে ভালো হাসপাতাল এই শহরের। খোঁজ করে ICU তে এসে দেখল চতুর্দিকে হরেক রকমের তার ও মেশিনবেষ্টিত হয়ে সরোজ শুয়ে আছে। চোখদুটি বোজা। মিনু কপালে হাত রাখল। মৌ রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকল, ‘বাবা।’

সরোজ চোখ মেলল, মনে হ’ল ওদের চিনতে পেরেছে।

নার্সের কাছে শুনল ডানদিক অবশ হয়ে গেছে। অতএব কথা বলা ও খাওয়া দুইই করতে পারবে না। মৌ কোথা থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসে বলল, ‘মা, বোস।’

মিনু তাকাল মৌয়ের দিকে, বলল, ‘তুই?’

‘আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসি মা, ভাইকে একটা ফোন করি। এখানে signal পাব না।’ মৌ চলে গেল।

মিনু চুপ করে বসে রইল, চেয়ে রইল ত্রিশ বছরের জীবনসাথীর দিকে। কি অসহায় শিশুর মত শুয়ে আছে। মনে মনে মাথা নাড়ল মিনু - না না শিশু নয়। শিশুও তো কাঁদে, আওয়াজ করে খায়, হাত পা নাড়ে। ওর ত’ সে ক্ষমতাও নেই। ওকে খাওয়ানো হচ্ছে নাক দিয়ে tube এর মধ্যে দিয়ে। ওর খাওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষমতা নেই। নেই হচ্ছে মত হাত পা নাড়ার শক্তি। কথাও বলতে পারবে না - একি বিষম শাস্তি। নার্স আবার ঘরে এল। Saline এর ব্যাগটা খুলে নিয়ে আবার একটা নতুন ব্যাগ লাগাতে লাগাতে বলল, ‘তোমার স্বামীর vital sign ভাল। sugar নেই, pressure নেই। হার্ট ভাল। এগুলো রোগীর ভাল হবার পক্ষে খুব জরুরী।’

মিনু হতবুদ্ধির মত বলল, ‘সবই যদি ভাল তবে stroke হল কেন?’

নার্স জবাব দিল না। saline এর ব্যাগটা লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বোধকরি এ প্রশ্নের উত্তর ওর জানা নেই। কিছুক্ষণ পর আবার মিনুর দিকে তাকাল নার্স। খুব আস্তে বলল, ‘It is a long way to go and very hard too. তবে ভয় পেয়ে না। মনে রেখ তুমি একা নও। এরকম অনেক ঘটে। তোমার স্বামীকে খুব কড়া ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ও এখন ঘুমাবে। ২:৩০ এ কাফেটারিয়া বন্ধ হয়ে যায়। খুলবে বিকেল পাঁচটায়। তোমরা গিয়ে খেয়ে এসো।’

মৌ নার্সকে বলল, ‘আমরা একটু ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?’

নার্স বলল, ‘বড় ডাক্তার আজ তো আর আসবেন না। কাল সকাল নটার মধ্যে যদি আসতে পার তবে দেখা হবে। আজ রাত আটটায় একজন ডাক্তার আসবেন তার সঙ্গে কথা বলতে পার।’

ছেলে রবি বিকেলবেলায় চলে এল। বন্ধুরা এল খবর পেয়ে সন্ধ্যার দিকে। আজ যেন সবাই সরোজের মত নির্বাক হয়ে গেছে। সরোজকে দেখে সবাই একে একে বিদায় নিল। বিদেশে আত্মীয় নেই - এই বন্ধুরাই আত্মীয়-বন্ধু সব। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ’ল রাত সাড়ে আটটায়। ডাক্তার এলেন। দাঁড়ালেন, ওদের সঙ্গে কথা বললেন। মৌ ও রবি কিছু কিছু প্রশ্ন করল। মিনুর মাথায় যেন কিছুই ঢুকল

না। চলে যাবার আগে ডাক্তার বলে গেলেন, ‘stroke victim family দের জন্য support group আছে। Internet এ যোগাযোগ করতে পার। তাতে তোমাদের পক্ষে সুবিধে হবে।’

অনেক রাত হ’ল। এবার ওরা বাড়ির পথে। মৌ ওর গাড়ি চালিয়ে বেরোল। মিনু এসে উঠল রবির গাড়িতে। রবি চিন্তিত মুখে গাড়ি চালাচ্ছে। মিনুর মনে হ’ল এক ধাক্কায় ছেলেমেয়ে দুটো বড় হয়ে গেল। রাস্তায় একবার Quiznos এর সামনে গাড়ি থামিয়ে রবি তিনটে sandwich কিনল। মিনুর খাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মুখে। কিছু বলল না। কোনোরকমে সামান্য কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মিনু শোবার ঘরে এসে। ঘুমের ঘোরে হাতটা গিয়ে পড়ল বিশাল বিছানায় যেখানে, সরোজ ঘুমায় সেখানে। জায়গাটা শূন্য। মিনু পাশ ফিরে শু’ল - সরোজ নিশ্চয় বাথরুমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল মিনুর। সরোজ তো বাথরুমে যায়নি। সরোজ তো ICU তে শুয়ে আছে। মিনু সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। আর ঘুম এল না। জানালার বাইরে নিশ্চিহ্ন কালো অন্ধকার - আলোর চিহ্ন পর্যাপ্ত নেই। সারাদিনের সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি দুঃখ-দুর্ভাবনা ওর শরীর মন কাঁপিয়ে প্রবল কান্নার বেগ ওকে যেন ভাসিয়ে দিল। দু-হাতে মুখ ঢাকল মিনু। অজান্তেই আত্ননাদ বেরিয়ে এল, ‘উঃ মাগো।’ অজস্র জলের ধারা ওর মুখ ভাসিয়ে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলায় বুকে ঝরে পড়তে লাগলো। এই নিদারুণ কান্নার সাক্ষী হয়ে রইল রাতের জমাট বাঁধা অন্ধকার। ৭

গৃহপ্রবেশ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

অসময়ে ছেলেকে দেখে স্মৃতিকণা ভীষণ অবাক, - ওমা, খোকা তুই? এই সাতসকালে? খবর সব ভাল তো?

ছোট সাত বাই আট ঘরখানার দরজায় অমল। দু পকেটে হাত, হাসছে মিটিমিটি, - সব ভাল। খুব ভাল। তুমি ঝটপট তৈরি হয়ে নাও তো।

- কেন রে?

- কেন আবার! তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি। এক্ষুণি।

কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না স্মৃতিকণার। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন না তো? নাতি নাটনিকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য কবে থেকে হেদিয়ে মরছেন। পূজোর সময় অষ্টমীর দিন এক বেলার জন্য নিয়ে গিয়েছিল অমল, সেও তো প্রায় ছ মাস হয়ে গেল। অমল শেষ এসেছিল হুপ্তা তিনেক আগে, তখনও একবার প্রসঙ্গটা পেড়েছিলেন, ছেলে হুঁ হাঁ করে এড়িয়ে গেছে। আজ কী এমন ঘটল যে নিয়মছাড়া সময়ে মাকে নিতে ছেলে ঘোড়ায় জিন দিয়ে হাজির?

প্রশ্ন করতে গিয়ে স্মৃতিকণা তোতলা হয়ে গেলেন, - এ এ এক্ষুণি যাব?

- এক্ষুণি। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায় পূজো আরম্ভ।

- কিসের পূজো?

- আমার গৃহপ্রবেশের।

- ওমা তাই? স্মৃতিকণার পলকে মনে পড়ে গেল আজ অক্ষয় তৃতীয়া। এমন শুভদিনেই তো নতুন বাড়িঘরে ঢুকতে হয়। চোখ বড় বড় করে বললেন, - তোর ফ্ল্যাট তবে হয়ে গেল?

- পুরো কমপ্লিট হয় নি। ভেতরে অনেক কাজ বাকি।

অকৃত্রিম খুশিতে মন ভরে গেছে স্মৃতিকণার। আনন্দিত সুরে বললেন, - কই আগের দিন যখন এলি তখনও তো ফ্ল্যাটের কথা কিছু বললি না?

- তখনও দিনক্ষণ কিছু ঠিক হয় নি।

- আরে বাবা, ফ্ল্যাটটা তৈরি হয়ে এসেছে সেটাও তো বলবি।

- তোমায় সারপ্রাইজ দেব বলে বলি নি। স্মৃতিকণার সিঙ্গলবেড খাটখানায় বসতে গিয়েও বসল না অমল, গাল ছড়িয়ে হাসছে, - নাও নাও, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। আমি ততক্ষণ তোমাদের অফিসের ফরম্যালিটিজগুলো সেরে আসি।

বলেই অমল হাঁটা দিয়েছে কেজো পায়ে। ছেলে মিলিয়ে যাওয়ার পরও স্মৃতিকণার দু চোখ দরজায় স্থির। শরীর জুড়ে হঠাৎ এমন কাঁপুনি আসে কেন? নয় নয় করে চার বছর হয়ে গেল এই বৃদ্ধাশ্রমে, ন' মাসে ছ' মাসে ছেলে বাড়ি নিয়ে যেতে তীব্র রোমাঞ্চ জাগে বটে, কিন্তু আজ অনুভূতি

যেন একটু অন্যরকম! হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে, স্মৃতিকণা স্পষ্ট লাবডুব শুনতে পাচ্ছেন। কেন যে এমন হচ্ছে?

খাবার ঘরে সকালের টিফিনের পালা শুরু হয়েছে। করিডোর ধরে একে একে চলেছেন বৃদ্ধারা। গুটি গুটি পায়ে। এখানে কারুর জন্য কারুর

অপেক্ষা করার প্রথা নেই, নির্মলা কিরণ শান্তি এ ঘরে বারেক উকি দিয়ে চলে গেলেন। স্মৃতিকণা কি জলখাবারটা সেরেই আসবেন? নিদেন পক্ষে চা? যাক্ গো, এখন আর গলা দিয়ে জলও নামবে না।

স্মৃতিকণার ঘরে আসবাব খুবই কম। দেওয়াল আলমারি, স্টিলর্যাক, এক সেট চেয়ার টেবিল, এক কোণে ঠাকুরের সিংহাসন, অন্য কোণে মাটির কুঁজো। আর খাট। ব্যাস্, এতেই ঘর প্রায় সবটা জুড়ে গেছে, নড়াচড়া জায়গাটি নেই। টানা দড়িতে ঝুলছে শাড়ি-সায়-গামছা, দেওয়ালে সিংহবাহিনীর ছবিও অলা এক পাতার ক্যালেন্ডার। মাথার দিকে দেওয়ালে সার সার ফটো। মধ্যযৌবনে অবিনাশ, পাশে মোটামুটি সুশ্রী স্মৃতিকণা, অবিনাশের কোলে খোকা, মাঝখানে বুলু টুলু। অবিনাশের একক ছবিও আছে একখানা, প্রৌঢ় বয়সের। শেষ বয়সে অবিনাশের আর কোন ছবি তোলা হয় নি, এই ছবিখানারই বড় কপি করে অবিনাশের শ্রাদ্ধের দিনে কাজে লাগানো হয়েছিল। খান দুয়েক পারিবারিক ফটোও আছে দেওয়ালে। বছকাল আগে তোলা। এখন হলদেটে, মলিন। শ্বশুর-শাশুড়ি-ভাসুর-দেওর-ননদ। বাবা-মা-ভাই-বোন। এঁদের অনেকেই এখন পরপারে, একজন দুজন শুধু টিকে আছেন।

ছবিগুলো অনামনস্ক চোখে দেখতে দেখতে মেঝেতে থেবড়ে বসলেন স্মৃতিকণা। হাঁটু মুড়তে ইদানিং বড় কষ্ট হয়, তবু ঝুঁকে টেনে হিঁচড়ে খাটের তলা থেকে বার করলেন সব্জে রঙ ট্রাংকখানা। নতুন কাপড় পরবেন কি আজ? পূজোর সময়ে বুলু টুলু খোকা সকলেই দেয় একটা করে শাড়ি, পরার উপলক্ষ আসে কই? আজ একটা নতুন শাড়ি পরাই যায়। দুটো বেশি শাড়ি ব্লাউজও কি নেবেন সঙ্গে? এখনই বা কোনটা পরেন?

বুলুর দেওয়া শাড়িখানাই বেশি মনে ধরল। নীল নকশাপাড়, নরম জমি, এতেই বেশি আরাম হবে। শাড়িটা পরে নিয়ে একখানা ঝোলাব্যাগও গুছিয়ে ফেললেন স্মৃতিকণা। অমল এসে গেছে, ব্যাগ কাঁধে তুলে নিল।

করিডোর ফাঁকা। খাবার ঘর থেকে মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসে। অমলের পিছু পিছু সিঁড়ির মুখে এসেছেন স্মৃতিকণা, সামনে হেমনলিনী।

খপ করে হেমনলিনী চেপে ধরেছেন স্মৃতিকণার হাত, - ভোর ভোর চললি কোথায় রে, অঁ্যা?

হেমনলিনী হোমের প্রবীণতম বাসিন্দা। স্মৃতিকণার চেয়ে ঢের বড়, প্রায় নব্বই ছুঁই ছুঁই। চোখ গেছে, কান গেছে, দেহ দুমড়ে জীর্ণ ধনুক, তবু সবার সব ব্যাপারে হেমনলিনীর কড়া খবরদারি।

স্মৃতিকণা একটু গলা চড়িয়েই বললেন, - ছেলে নিতে এসেছে। বাড়ি যাচ্ছি।

- মেলা? মেলা আবার কোথায় এখন?

- মেলা নয়, ছেলে। স্মৃতিকণা আরও গলা তুললেন, - ছেলে নিতে এসেছে।

- চৈচাচ্ছিস কেন? আমি কি কালা? হেমনলিনীর স্বর খনখন বেজে উঠল, - ছেলে নিতে এসেছে তো শোনানোর কী আছে? যন্ত সব

আদিখেতা।

হেমনলিনীর কথাবার্তার ধরনই এরকম। চ্যাটাং চ্যাটাং। হোমের বাসিন্দারা কেউই তাঁকে খুব একটা পছন্দ করে না। অন্য দিন হলে স্মৃতিকণাও হয়তো ঝোঁঝে উঠতেন, আজ কথা বাড়ালেন না। চিত্ত প্রসন্ন বলেই বুঝি কিঞ্চিৎ মায়াও জাগল। আহা রে, কতকাল হেমদিদির কেউ খোঁজ নেয় না। নাতি নাতবউ কেউ না। অন্যের ঘরে আপনজন এলে হেমদিদির তো মনে লাগবেই।

হেমনলিনীকে পেরিয়ে স্মৃতিকণারা বৃদ্ধাশ্রমের গেটে এলেন। সবে নটা বাজে, এর মধ্যেই বৈশাখের সূর্য্য অতি প্রখর। পৃথিবীকে মনে হয় জ্বলন্ত উন্ন। এদিক ওদিক সবুজ আছে অনেক, হোমেও গাছগাছালির কমতি নেই, তবু কড়া তাপে চামড়া যেন বলসে যায়।

রাস্তায় বেরিয়ে অমল দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, - দাঁড়াও, একটা ট্যাক্সি ধরে আনি।

- ট্যাক্সি কেন রে, বাসই তো ভাল। স্মৃতিকণা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। ছেলের সংসার থেকে কবেই সরে এসেছেন, তবু এখনও তাঁর জন্য ছেলের অপব্যয় বুঝি সহ্য হয় না। বললেন, - এখনও বাসে তেমন ভিড় হয় নি, আমি খুব উঠতে পারব।

- না না, দেরী হয়ে যাবে। ঠাকুরমশাই ঠিক সাড়ে নটায় এসে যাবেন। আমি না পৌঁছলে শীলা টেনশান শুরু করে দেবে।

বউমার তো সবেতেই টেনশান। বলতে গিয়েও কৌৎস করে কথাটা গিলে নিলেন স্মৃতিকণা। কলে জল আসতে পাঁচ মিনিট দেরী হলে টেনশান, আকাশে মেঘ করলে টেনশান, ছেলে ঠাকুরমার হাত ধরে পার্কে গেলে টেনশান। এমনকি অমল মায়ের কাছে বেশিক্ষণ বসে থাকলেও টেনশান হয় শীলার। সংসারে তাই নিয়েও কম অশান্তি গেছে ! থাক্ গে, শুভদিনে ওসব স্মৃতি মনে না আনাই ভাল, ছেলের মেজাজ খিঁচড়ে যেতে পারে।

অমল ট্যাক্সি পাকড়াও করে ফেলেছে। স্মৃতিকণাকে উঠিয়ে আয়েশ করে হেলান দিল। ভারিষ্কিগলায় নির্দেশ ছুঁড়ল, - যাদবপুর চলো, কৃষ্ণা গ্লাস।

অমলের বাচনভঙ্গিতে আজ যেন একটা আলাদা ব্যাক্তিত্ব। ব্যাক্তিত্ব নাকি পরিপূর্ণতা? প্রাপ্তির। সুখের।

স্মৃতিকণা আড়চোখে দেখছিলেন ছেলেকে। এই সেই খোকা যে ছোটবেলায় মাকে পাশে না পেলে মার শাড়ি বুকে আঁকড়ে ঘুমোত, মা যেখানেই যাক ছেলে ল্যাংবোট ! দুই মেয়ে হওয়ার প্রায় আট বছর পর ছেলে, অবিনাশও ছেলে বলতে অজ্ঞান ছিলেন। সেই ছেলে চোখের সামনে হামা টানল, হাঁটতে শিখল, কথা বলল, স্কুলে গেল, কলেজ পাশ করল !

সময় কী দ্রুত ছুটে পালায়। দ্যাখ না দ্যাখ সেই খোকাই কখন শীলার স্বামী, রিন্টু-মিন্টির বাবা, একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। দ্যাখ না দ্যাখ খোকার সংসারে স্মৃতিকণা নিজেই কখন বাড়তি। ফালতু।

অমলের চোখ জানলার বাইরে। স্মৃতিকণা মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন, - হ্যাঁ রে

খোকা, বললি ফ্ল্যাটের কাজ এখনও পুরো হয় নি, এখনই গৃহপ্রবেশ করছিস যে?

অমল ফিরল, - উপায় ছিল না মা। কাঁহাতক আর বাড়িভাড়া গুণব? এদিকে ফ্ল্যাটের লোনও কাটা শুরু হয়ে গেছে দুই ধাক্কায় একেবারে জেরবার অবস্থা। ঢুকে গিয়ে আস্তে আস্তে ফিটিংস-টিটিংসগুলো করব।

- ঢুকে পড়লে কাজ শেষ করার অসুবিধে হবে না?

তা হোক। টাকাগুলো তো বাঁচুক। হিসেব করে দেখলাম সংসারের আর কোনও খরচই তো কাটেল করা যাবে না, মাত্র ঐ ভাড়টুকুই যা

কথাটায় স্মৃতিকণা বেশ সংকুচিত বোধ করলেন। ছেলে হয়তো অত কিছু ভেবে বলে নি, তবু কোথায় যেন কাঁটা ফোটে। বৃদ্ধাশ্রমে মাস মাস সাড়ে ছশো করে পড়ে, স্মৃতিকণা উইডো পেনশান পান সাতশো, হোমের টাকা মটোনের পর হাতখরচ বলে কিছুই থাকে না, প্রতি মাসে মাকে তাই শ'চারেক করে দেয় অমল। স্মৃতিকণার প্রবল আপত্তি ছিল, নিতে চান নি। অমলের মুখ ভার হয়েছিল বলে শেষমেশ আপত্তিটা আর ধোপে টেকে নি। এখন টাকাটা প্রায় বরাদ্দের মতো হয়ে গেছে। যে কটা খরচ কমানো যাবে না কিছুতেই, তার মধ্যে কি খোকা ঐ টাকাটাও ধরল?

অমল রুমালে চশমার কাচ মুছেছে। টেরিয়ে দেখল মাকে, - তোমার হাঁটুর ব্যাথাটা এখন কেমন আছে মা?

স্মৃতিকণা ছোট্ট একটা শ্বাস ফেললেন, - আছে। ও তো বয়েসের সঙ্গী।

- হোমে ডাক্তার আসছে রেগুলার? দেখছে?

- হ্যাঁ। আসে তো রোববার রোববার।

- চারতলায় উঠতে পারবে তো? কষ্ট হবে না?

কষ্ট ! বুকের অনেক ভেতর দিয়ে একটা চোরা বিষাদের স্রোত বয়ে গেল স্মৃতিকণার। ছেলে মায়ের হাঁটুর কষ্টের খোঁজ নেয়, মনোকষ্ট বোঝে না।

মুখে হাসি টেনে স্মৃতিকণা বললেন, - তুই ফ্ল্যাট করেছিস, আর আমি সেখানে উঠতে পারব না? তোর বাবার কত সাধ ছিল একটা বাড়ি করার

সাধ ছিল বোলো না। বোলো, শেষ বয়সে সাধ জেগেছিল। তেমন ইচ্ছে থাকলে চাকরি করতে করতেই গড়িয়া নরেন্দ্রপুর কোথাও একটা জমি কিনতে পারত, সারাটা জীবন আমাদের ভাড়াবাড়ির ঘানি টানতে হত না। ইশ্, ওসব দিকে জমি কত সস্তা ছিল তখন।

অবিনাশ নিখুঁত চুলচেরা হিসেবী ছিলেন না, স্মৃতিকণা জানেন। আবার সংসারের অনেক দায় যে হাসিমুখে বহন করেছেন তিনি, এও তো দেখেছেন স্মৃতিকণা। তিন তিনটে বোনের বিয়ে দিয়েছেন, ছোট ভাই বহুদিন বেকার হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরত, তারই মধ্যে বিয়ে করে বসল, তার সংসারও টেনেছেন, নিজের দুই মেয়েকে ভাল ঘরে পাঠাই করেছেন। রিটারার করবার আগে পর্যন্ত কি আপন আশ্রয়ের কথা ভাবার অবকাশ পেয়েছিলেন অবিনাশ? অবশ্য খোকা বলতেই পারে এর মধ্যেও তো অনেকে অনেক কিছু করে ফেলে। ধারদেনা করে, পেটে কিল মেরে, ছেলেমেয়েদের হীন দশায় রেখে, অথবা চুরি বাটপারি করে। কোনটাই করতে পারেন নি বলেই তো তাঁর মৃত্যুর পর সাঁইত্রিশের বি নগেন রায় লেনের দু কামরার ভাড়াবাড়িটা একদিন বড় বেশি ছোট ছোট ঠেকতে লাগল অমল আর শীলার। রিন্টু মিন্টি বড় হচ্ছে, তাদের পড়াশুনার জায়গা নেই। একটা ঘর মায়ের দখলে, একটা ঘরে নিজেরা, বাইরের লোক এলে বসানো যায় না। কত রকমের ক্ষোভ,

কত বিরক্তি। অথচ সেই বাড়িতেই তারা কত কাল দাদুর দস্তানার মতো আট নটা প্রাণী থেকেছে। যাক্ গো যাক্ , স্বামীর অদূরদর্শিতার গুণাগার দিতেই না ছেলের দুর্বল কণ্ঠের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে মান বাঁচাতে পালিয়ে এলেন স্মৃতিকণা।

মা ছেলে নিশ্চুপ। খুচরো খাচরা জ্যাম ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছে ট্যাক্সি। বেহালা থেকে যাদবপুর কতটুকুই বা পথ, এটুকু রাস্তা পেরোতে ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল।

সরু গলি দিয়ে ঢুকলো ট্যাক্সি। থেমেছে সদ্য প্লাস্টার করা চারতলা এক ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন স্মৃতিকণা, - বাহু, এ তো খাসা বাড়ি রে।

- ঐ আর কি। কোনও মতে একটা মাথা গাঁজার ঠাই হল।

- তা দোতলা তিনতলাই তো বেশ ছিল, চারতলা নিতে গেলি কেন?

- সব কি নিজের ইচ্ছেয় হয় মা? গেট টপকে অর্ধসমাপ্ত সিঁড়ি বেয়ে মাকে নিয়ে উঠছে অমল, - কো-অপারেটিভ করে ফ্ল্যাট, লটারিতে যার ভাগ্যে যা জুটেছে। এমন অবশ্য ভালই হয়েছে, স্কোয়ার ফিটে পঁচিশ টাকা করে ছাড় পেয়ে গেলাম। সব মিলিয়ে প্রায় ষোল হাজার টাকা বাঁচল। কম কি, বল?

- হুঁ। হিসেব নিকেশ কিছু না বুঝেই মাথা দোলালেন স্মৃতিকণা, - চারতলায় অবশ্য হাওয়া বাতাসটাও বেশি, ধুলো বালি কম, মশামাছি কম।

শীলাকেও তো তাই বুঝিয়েছি। ওর তো এখন থেকেই টেনশান বুড়ো বয়েসে কী করে উঠবে নামবে।

আবার সেই টেনশান ! স্মৃতিকণা বললেন না কিছু, হাসলেন সামান্য। ঈশ্বর না করুন এর চেয়ে কোনও গভীর টেনশান বুড়ো বয়েসে না আসে খোকা আর শীলার।

চারতলার ফ্ল্যাটের দরজা হাট। দরজায় আলপনা, ঘট, ডাব, পুচকে পুচকে কলাগাছ। গোলা সিঁদুরের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছে বাইরের দেওয়ালে। শুভকর্মের প্রতীক।

টুকুই একটা বড় মতন জায়গা। আসবাবহীন। সেখানেই পূজোর আয়োজন। পিতলের থালায়, কাঠের রেকাবিতে সাজানো হয়েছে উপচার, হাঁটু গোড়ে বসে তদারক করছে শীলা। ঠাকুরমশাই ফর্দ মিলিয়ে জিনিস দেখছে, তাকে যেন শীলা বলছেও কি সব। শীলার পড়নে আজ লাল পাড় গরদ, কপালে সিঁদুরের চাকা টিপ, ভেজা চুল পিঠে ছড়ানো, মুখভর্তি সুখ। শীলার পাশটিতে একটি মেয়ে। আগে একবারই মাত্র মেয়েটিকে দেখেছেন স্মৃতিকণা। শীলার ভাইয়ের বৌ।

ঠাকুমাকে দেখে মাত্র কোথেকে যেন ছুটে এল রিন্টু মিস্তি। তাদের গায়ে মাথায় আলগা করে হাত বোলালেন। নাতি নাতনিকে ছুঁলেই ভারী অদ্ভুত এক শিহরন জাগে বুকে। চিনচিন করে সুখ। দুঃখও।

দেওয়াল ঘেঁসে গোটা কয়েক ডেকরেটারের চেয়ার পাতা। বোধহয় অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে। স্মৃতিকণা নিজেই চেয়ার টেনে বসলেন এক পাশে।

শীলারা কাজ ফেলে উঠে এল। শীলার ভাইয়ের বৌ টিপ করে পা ছুঁল স্মৃতিকণার, - কেমন আছেন মাসিমা?

স্মৃতিকণা মেয়েটির চিবুক ছুঁলেন, - ভাল। তা অরুণ কোথায়? তাকে যে দেখছি না?

- কী সব যেন কিনতে গেল। এখনই এসে যাবে।

শীলা ব্যস্ত সমস্ত মুখে বলল, - মা, আপনার আসতে কষ্ট হয় নি তো?

- কিসের কষ্ট?

- না মানে এই রোদ্দুর এতটা সিঁড়ি ভাঙ্গা

- না রে মা, আমি ঠিক আছি। স্মৃতিকণা নরম হাসলেন, - তোমাদের আয়োজন শেষ?

- মোটামুটি। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

দেওয়াল থেকে হালকা একটা গন্ধ উঠছে। চুন? নাকি অন্য কিছু? নাকে লাগছে বেশ। স্মৃতিকণা চোখ ঘুরিয়ে দেখছিলেন চারদিকে। নগেন রায় লেনের বাড়িটা এখনও রক্ত মজ্জায় মিশে আছে, নতুন এই ফ্ল্যাটটাকে কেমন অনাস্বীয় অনাস্বীয় লাগে। অচেনা অচেনা।

মনে হচ্ছে যেন নিজের ছেলের নয়, অন্য কারুর ঘরে ঢুকে পড়েছেন স্মৃতিকণা।

স্মৃতিকণা আঁচলে ঘাম মুছলেন। নতুন বাড়িতে বেশী উত্তাপও থাকে কি?

রিন্টু মিস্তি ঘুরছে এপাশ ওপাশ। শীলা পাশে এসে বসল, - কেমন দেখছেন মা?

- খুব সুন্দর।

গরম লাগছে? টেবিল ফ্যানটা ঘুরিয়ে দেব?

- না না, হাওয়া তো আসছে। স্মৃতিকণা আরও সপ্রতিভ হলেন, - বুলু টুলুরা আসবে না?

- ছোড়দিরা আজ খুব ব্যস্ত। ছোড়দির ভাসুরের মেয়েকে আজ দেখতে আসবে। আর বড়দি জামাইবাবুরা হয়তো বিকেলে....। বড়জামাইবাবুর তো সামনেই রিটার্নারমেন্ট, এখন নাকি কামাই করা মুশ্কিল।

মেয়েদের অনুপস্থিতির কারণগুলো স্মৃতিকণার মোটেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। তাঁর দুই মেয়ের কেউই শীলার ওপর প্রীত নয়, স্মৃতিকণা জানেন। মনে মনে একটু হতাশই হলেন স্মৃতিকণা। মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে একটা অন্য রকম ভাললাগার অনুভূতি হয়।

শীলা বকবক করেই চলেছে, - একদম নমো নমো করে সারছি মা, বড় অনুষ্ঠান কিছু করলাম না। কেন করব বলুন? রাজ্যের খরচা বাকি এখনও। তাও নয় করে তিরিশ বত্রিশজন আসবে আজ। আপনার ছেলের কয়েক জন বন্ধুকে বলেছি, উইথ ফ্যামিলি, এদিকে আমার বোন ভগ্নীপতিরা। পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকদেরও বললাম। ওরাই তো এখন আসল প্রতিবেশী যেচে কারেন্টের লাইন দিল আজ। আপনার ছেলের খুব ইচ্ছে ছিল ঠাকুর এনে রান্না করানোর, আমিই নিষেধ করলাম। ক্যাটারারকে বলে দিয়েছি, ঠিক একটার সময় সব রেডি করে নিয়ে চলে আসবে

স্মৃতিকণার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল মিস্তি। হঠাৎ ফুট কাটল, - জানো ঠাম্মা, বাবা আর মা এখন তিন দিন এখানে রাতে একা থাকবে। এই ন্যাড়া বাড়িতে। হিহি। শীতলপাটি আর তোষক এনেছে মা, তাই পেতে শোবে।

একদা মুখর শীলার মুখে সলাজ হাসি, - গৃহপ্রবেশের পর নাকি তেরাঙির জোড়ে থাকতে হয়। এতেই নাকি মায়া বসে।

- তাই বুঝি?

- হ্যাঁ মা। পরে ফার্নিচার টার্নিচার নিয়ে পাকাপাকি ভাবে আসব। আষাঢ় মাস নাগাদ।

অমল প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে ধুতি পরে ঠাকুর মশাইয়ের পাশে বসেছে। চৈঁচিয়ে বলল, - ভ্যাজরং ভ্যাজরং না করে মাকে আগে ফ্ল্যাটটা ভাল করে দেখাও না।

শীলা অপ্রস্তুত মুখে চেয়ার ছাড়ল, - ও হ্যাঁ হ্যাঁ।

মিন্টির হাত ধরে পুত্রবধূর পিছন পিছন গেলেন স্মৃতিকণা। ঘুরছেন। দেখছেন। বুকো আবার লাবডুব ধ্বনি। হঠাৎই। কেন যে?

প্রথম ঘরটা দেখিয়ে শীলা পেশাদার গাইডের মতো বলল, - এইটা এগারো বাই দশ। আমাদের রুম। ওই দেখুন, পূব দিক পুরো খোলা। ওদিকের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে অনেকটা দূর অদিক দেখতে পাওয়া যায়। ব্যালকনিটা ছোট হল, পাঁচ বাই তিন। আপনার ছেলের তো খুব বাগান করার শখ, ওখানেই কোনও মতে

এবার পাশের ঘর। শীলার ধারাবিবরণী চলছে। এটা রিন্টু মিন্টির জায়গা। দু দুখানা সিঙ্গলবেড খাট পড়বে এ ঘরে। সঙ্গে বুক-র্যাক আলমারি চেয়ার টেবিল।

রান্নাঘরও দেখলেন স্মৃতিকণা। পরিপাটি বন্দোবস্ত। গ্যাস রাখার তাক, সিংক, বেসিন। দেওয়ালে প্লাইউডের কাবার্ড। শীলার ভাঁড়ার থাকবে।

বাথরুম তেমন বড় নয়। তবে সাহেবি সিস্টেম। মাথায় টানা লফট আছে, পুরনো ভাঙা তুলে রাখা যাবে।

শীলার ফ্ল্যাট পরিক্রমা শেষ। উদগ্রীব সুরে জিজ্ঞেস করল, - পছন্দ হল মা?

স্মৃতিকণা বড় করে ঘাড় হেলালেন, - খুউব।

- ছেলেমেয়ে দুটোর ঘর তেমন বড় হল না।

- হুম্।

- তবে ড্রইং-ডাইনিংটা খুব ছোট হয় নি, কি বলুন?

- নাহ্, ভালই তো।

- যাকগে যাক, আমরা তো প্রাণী মাত্র চারজন, আমাদের এতেই কুলিয়ে যাবে। তাই না মা?

হয়তো যাবে। হয়তো যাবে না। হয়তো একদিন চারতলার এই পুবে ব্যালকনিওয়ালা ঝলমলে ফ্ল্যাটে অমল আর শীলাও বাড়তি হয়ে যাবে।

সেই অনাগত দিনের কথা এখন অবশ্য ভবছিলেন না স্মৃতিকণা। তাঁর হৃদয়ের গভীরে, অনেক অতলে, কোথায় যেন একটা রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে। নিঃসাড়ো। নগেন রায় লেনের জীর্ণ বাড়িটায় না থেকেও সংসারে কোথাও যেন একটা গৃহকোণ আছে তাঁর। হারিয়ে গেলেও আছে। এই নবীন গৃহে তাঁর আর এতটুকু অস্তিত্ব থাকল না।

স্মৃতিকণা কি জানতেন না তাঁকে এই বাড়িতে থাকার জন্য ডাকবে না ছেলের বৌ? জানতেন তো। তবু বুঝি একটা ক্ষীণ আশা ছিল অন্তত কয়েক ফুট জায়গা হয়তো বরাদ্দ হবে তাঁর জন্যে। ছেলের এই নতুন ঘরে।

ভ্রম ঘুচে গেছে।

স্মৃতিকণার জন্য অমলের ঘরে এক সেন্টিমিটার জায়গাও নেই।

অমল ঠাকুরমশাইয়ের পাশে বসে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। পঞ্চপ্রদীপ জ্বলেছেন ঠাকুরমশাই। স্মৃতিকণার কেনা পঞ্চপ্রদীপ।

এক দৃষ্টে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আগুনের শিখা ঝাপসা ক্রমশঃ। চোয়ালে চোয়াল ঘসে নিজেকে স্থিত করলেন

স্মৃতিকণা।

ছি স্মৃতিকণা, ছেলের শুভ কাজের দিন মাকে চোখের জল ফেলতে নেই রে !

স্মৃতিকণার হৃৎপিণ্ডের লাবডুব ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকল তিনটির পর। টুকুন জিড়িয়ে সন্ধ্যার আগে বেরিয়ে পড়লেন স্মৃতিকণা। ফিরছেন। ঝোলাব্যাগটি বুকো আঁকড়ে। দিনভর খাটাখাটুনির পর অমল শ্রান্ত, স্মৃতিকণাকে পৌঁছে দিচ্ছে অমলের শ্যালক।

বৃদ্ধাশ্রমের গেটের সামনে অরুণ ট্যাক্সি করে নামিয়ে দিয়ে গেল। অন্দরে ঢুকতে গিয়ে ক্ষণিক দাঁড়ালেন স্মৃতিকণা। দিনের শেষ আলো মাথা সাদা বাড়িখানা দেখছেন। নতুন চোখে। নির্নিমেষ।

চার বছরে তেরাতিরের পালা সাদ্ধ হল। আজ স্মৃতিকণার পাকাপাকি গৃহপ্রবেশ। এই বৃদ্ধাশ্রমে। ৭

‘সে’

সঞ্জয় মাইতি

(১)

- কফি খাবে?

- না, আজ থাক। বড় ঘুম পাচ্ছে। আজ সারাদিন অনেকগুলো ইমার্জেন্সি কেস ছিল, বুঝলে? খুব ধকল গেছে। চিন্তাদাও তো আবার ছুটিতে, ওনার কেসগুলো...

- থাক, চল শুয়ে পড়া।

এই হয়েছে। এটাই হ'ল আপাততঃ দিয়ার নিত্যকার স্বাস্থ্য। স্বামী কোলকাতা শহরের নাম করা সার্জেন। কত নাম ডাক। কত ব্যস্ত। অনিমেষ মুখার্জি বলতে তো সারা শহর অজ্ঞান। এত বড় মাপের হার্ট সার্জেন নাকি কোলকাতা কেন, সারা দেশেই জন্মায় নি। ওর এক একটা অপারেশান নাকি কলেজে পড়ান হয় - দেশে বিদেশে ওর রিসার্চ নিয়ে তোলপাড়।

দিয়ার গলার শুষ্কতায় অনিমেষ বুঝল, নাঃ আবার একটা রাত, দিয়ার সেই বায়না। কিন্তু কিই বা করে অনিমেষ। তার এত দায়িত্ব।

জামা ছাড়তে ছাড়তে আর একবার মনে মনে দিয়ার তারিফ না করে পারল না অনিমেষ। শোবার ঘরটা কি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে দিয়া। শুধুই সুরচিসম্পন্ন নয় দিয়া, ঘরটা কেমন যেন একটা মনের ছোঁয়া দিয়ে সাজান। এখানে ঢুকলে মনে হয় শান্তি। আজ আর ঘুমটা যেন ঠিকমত জমিয়ে আসছে না। পূর্ব দিকের জানালাটার দিকে পাশ ফিরে ঘুমানটা অনিমেষের চিরকালেরই অভ্যাস। জানালাটা খোলা, কিন্তু দিয়া আজকে পর্দাটা টেনে রেখেছে। বাইরে বোধহয় চাঁদ উঠেছে, কিন্তু দেখার উপায় নেই। জানালার ওপর কি সুন্দর তিনটে পটে ক্যাকটাস রেখেছে দিয়া। সত্যি দিয়ার মত মেয়ে হয় না। তিন তিনটে বছর অনিমেষের মত কাঠখোঁট্টা একটা মানুষের সঙ্গে এমন ধৈর্য নিয়ে কি থাকা যায়? প্রায় চার বছর আগেকার কথা। বছর চল্লিশের অনিমেষ তখন শহরের সব থেকে নাম করা হার্ট ফাউন্ডেশন ‘ওলিয়েগার’ এর বেস্ট সার্জেন। এই অল্প বয়সেই অনিমেষ প্রতিভাবশে সার্জারিতে কোলকাতার তাবড় তাবড় ডাক্তারদের উপরে উঠে গেছে। লোকে বলে বাপকা বেটা। বাবা, মানে অনিরুদ্ধ মুখার্জিও তো হার্ট সার্জারিতে অসামান্য কীর্তি রেখে গেছেন। তবে ছোটবেলা অনিমেষের তেমন সুখে কাটে নি। মা বাবার সেপারেশান তাকে টিনএজ বয়সে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মায়ের মুখটা মনে পড়ে। কলেজে ফাস্ট ইয়ারেই মা মারা গেলেন। বাবার কাছে বরাবর ছিল অনিমেষ। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা হত বটে। তবে কেন বাবার বাড়িতে, কাজের লোকেদের হাতে মানুষ হচ্ছে এ নিয়ে কখনো প্রশ্ন করে নি।

শাড়ির খসখস আর চুড়ির ঠুংঠাং আওয়াজে বুঝল দিয়া ঘরে এল। পরের

ইভেন্টগুলো ভাল করেই জানে অনিমেষ। প্রথমে রূপচর্চা। আর করবে নাই বা কেন? কি মিষ্টি দেখতে দিয়াকে। প্রথম দেখাতেই তো অনিমেষ একেবারে কাৎ। এই তো বছর চারেক আগে - সেমিনারে গিয়েছিল অনিমেষ মুম্বাইতে। সেমিনারের শেষে সবাই ধরল, একবার গোয়া ঘুরে আসা যাক। অনিমেষ কোনোদিন গোয়া যায় নি। রাজি হয়ে গেল তাই অবশেষে। প্রথমদিন ব্রেকফাস্টে খবরের কাগজটা সবে ধরেছে -

দিয়া আজ তাড়াতাড়িই বিছানায় এল যেন। অন্ধকার, লাইট নিভিয়ে দিয়েছে দিয়া। খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর অবাক হ'ল অনিমেষ। আশা করেছিল দিয়া সেইভাবেই শুরু করবে -

- শোন, তুমি তো তোমার ‘ওলিয়েগার’ নিয়েই থাক। আমি সারাদিন কি নিয়ে থাকি বল তো? কেন তুমি একটা ছেলে-মেয়ে চাও না, অনিমেষ? আমি সারাটা দিন ওকে নিয়েই থাকতাম।

- দিয়া, আমার এখন কত দায়িত্ব। আমাকে আরও একটু এস্টাব্লিশ করে নিতে হবে নিজেকে। তাছাড়া একটা বাচ্চার জন্য কত রেসপন্সিবিলিটি। আমার কি অত সময় আছে?

- না গো, আমি তো সবই সামলাব।

- কিন্তু দিয়া, একটা বাচ্চারও তো বাবার কাছেও অনেক কিছু পাওনা থাকে। আমি যদি...

নাঃ আজ আর কিছুই বলল না দিয়া। গভীর ঘুমে চোখদুটো জড়িয়ে এল অনিমেষের।

- ডু ইউ মাইন্ড ইফ আই সিট হিয়ার?

কাগজের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অনিমেষ। মধুর কণ্ঠে আবার প্রশ্ন -

- এক্সকিউজ মি! ডু ইউ মাইন্ড ইফ আই জয়েন ইউ?

এতক্ষণে ঘোর কাটিয়ে উঠেছে অনিমেষ। এক সুন্দরী মিষ্টিভাষী তরুণী তার সাথে টেবিল শেয়ার করার পার্মিশান চাইছে। আসলে হোটেলের ব্রেকফাস্টের ঘরে তো তিল ধারণের জায়গা নেই।

- সিওর, প্লিজ।

- আমার নাম ‘দিয়া’।

- আর আমি ‘অনিমেষ’। আপনি কি করে জানলেন যে আমি বাঙালি?

- আপনার হাতব্যাগের হাতলে নেমট্যাগ - ‘ডাঃ অনিমেষ মুখার্জি’। বাকিটা স্রেফ গেস্‌সুয়ার্ক। আপনি কোলকাতা থেকে?

- হ্যাঁ, আপনি?

মেয়েটার তারিফ না করে পারা যায় না। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটো।

- আমি দিল্লী থেকে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল অনিমেষ। অ্যালার্ম ব্লকটা বেজেই চলেছে। তা হলে স্বপ্নই দেখছিল বটে, তবু তো সুখস্বপ্ন। সকালবেলা মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠল। নাঃ উঠে পড়তে হবে আজকে এক্সকুগি। স্বপ্নের রেশ টেনে রাখার উপায় নেই আজ। রেডি হতে হবে, আজকে তো আবার ওই ছোট্ট মিলনের অপারেশান। সকালেই। বেশ কমপ্লিকেটেড সার্জারি।

দিয়া কিছুক্ষণ আগেই উঠে পড়েছে। ওর অনেক সকাল সকাল ওঠার অভ্যাস। অনিমেষ অবশ্য কাল রাতে দিয়াকে বলে রেখেছিল, যে ওকে সকাল সকালই বেরোতে হবে আজ। তাই বোধহয় ব্রেকফাস্ট রেডি করছে। বাথরুমে যাবার আগে আধখোলা শোবার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, দিয়া ব্রেকফাস্ট টেবিলটা গুছাচ্ছে। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা সাজবিহীন খোলাচুলে দিয়াকে কি সুন্দর লাগছে! নিজেকে আরেকবার খুব লাকি মনে হ'ল। মনে মনে ভাবল - দিয়াকে অনিমেষ সত্যি কত ভালবাসে। শুধু ওর একটা চাহিদা কেন জানি অনিমেষ এখনো মিটিয়ে উঠতে পারে নি। এছাড়া দিয়াকে তো সবই দিয়েছে অনিমেষ। তবু দিয়া যে কেন এত অবুঝ এ ব্যাপারে...

সকালবেলা রেড রোড দিয়ে অনিমেষের গাড়ি ছুটে চলেছে। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনের সিটে বসে অনিমেষ এখন অপারেশানের দিকে মন দিল। ছোট্ট ছেলোটো, কি মিষ্টি! বড়জোর সাত কি আট হবে। জন্ম থেকেই হার্ট এ একটা ভীষণ গণ্ডগোল, একটা ভালভ ঠিক মত কাজ করে না। তারপর আবার বয়সের সাথে সাথে হার্টটারও নরম্যাল গ্রোথ হচ্ছে না। অনিমেষ কিছুদিন যাবৎ দেশে বিদেশে যত বড় বড় ডাক্তার আছে, সবার সঙ্গে কনসাল্ট কনসাল্ট করে চলেছে।

প্রায় চারটে বাজে। টানা চার ঘন্টা ধরে অপারেশানটা চলল আজকে। নিজের চেম্বারে বসে চোখটা বন্ধ করে একটু জিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল অনিমেষ। বিয়ের পরে পরে অনিমেষ প্রত্যেকটা অপারেশানের ঠিক পরেই দিয়াকে একবার ফোন করত। যে দিন অপারেশান থাকত না, সে দিনগুলোতে অনেকবার দিয়ার ফোন আসত। দরকার না থাকলে আজকাল আর ফোন করে না দিয়া। গত তিন বছরে অনিমেষ তার আচার আচরণে দিয়াকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে কাজের সময় অনিমেষ আর কিছু জানতে চায় না। আর দিয়াও বুঝে গেছে যে, দিয়ার জন্যে অনিমেষের সময় ওর কাজের সময়ের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

যাই হোক আজকের অপারেশানটা সাকসেসফুলই হয়েছে। তবে কমপ্লিকেসি তো যখন তখনই হতে পারে। কি ফুটফুটে ছেলোটো। এই তো মাত্র কদিনের চেনা শোনা। এর মধ্যেই মনে হয় যেন কত আপনজন। একটু আগেই অনিমেষ গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে, সবই ঠিক আছে। এবার জেনারেল ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরতে পারলে শান্তি।

বেশ কদিন কেটে গিয়েছে। মিলন ভালই আছে। আজ সন্ধ্যাটা দিয়ার সঙ্গে একটু কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করবে ঠিক করেছিল অনিমেষ। তাড়াতাড়ি বাড়িও ফিরেছিল। দিয়া তো অবাক হয়ে বলেই ফেলল - 'তোমার শরীর খারাপ হ'ল না তো?' হেসে ফেলেছিল অনিমেষ। হঠাৎ কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। ওলিয়েন্ডার থেকে ইভা ফোন করে জানাল, মিলন ভাল নেই। জামা কাপড় ছাড়ার কোনো অবকাশ পায় নি - ছুটে গেল অনিমেষ ওলিয়েন্ডার এ। দিয়া উৎকণ্ঠা আর দুঃখ মেশান গলায় একবার বলল - 'একটা খবর দিও।' বুঝল না অনিমেষের কানে কথটা ঢুকল কিনা। দিয়া ভাল করেই জানে অনিমেষ এখন ডুবে যাবে ওর নিজের জগতে। এই সমস্ত ইমার্জেন্সির সময় অনিমেষের কাছে দিয়া সম্পূর্ণ নন-এক্সিস্টেন্ট। ওর জগৎ এখন শুধুই ওলিয়েন্ডার ঘিরে। কি জানে কত দিন চলবে এবারের ইমার্জেন্সি। সেই কদিন দিয়া একেবারে একা। এই সময়গুলো যেন আর কাটিয়ে উঠতে পারে না দিয়া। অনিমেষের এই রকমের ইমার্জেন্সি তো লেগেই আছে। বড় মাপের ডাক্তারদের বউগুলোর বোধহয় এ রকমই জীবন। এই সময়টাতে ওর একমাত্র কথা বলার সঙ্গী, ওর দিদি হিয়া। তাও আবার ফোনে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে দিয়া দেখল, রাত প্রায় এগারটা বাজে।

সারারাত অনিমেষ ফেরে নি। কোনো ফোনও করে নি। দিয়া একবার ভাবল ওই একবার ফোন করে নেবে। চায়ের জলটা বসিয়ে এসে করলও। কিন্তু 'নো অ্যান্সার'। অনিমেষ ফিরল বিকেলের দিকে। সারাদিন দিয়া আরও পাঁচ বার ফোন করেছিল অনিমেষকে। কোনো খবর পায় নি। বাড়িতে ঢুকে গম্ভীর মুখে জানাল - 'আপাততঃ সামাল দেওয়া গেছে। তবে মিলন এখনও ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন এ।' কোনো রকমে মুখে কিছু গুঁজ গুঁম হয়ে বসে রইল। অনেক রাতে ওর স্যার বিমলেন্দু সান্যালকে ফোন করল অনিমেষ। অনেকক্ষণ ধরে অনেক আলোচনা করল ওরা ফোনে। দিয়া অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অনিমেষও এবার শুয়ে পড়ল।

প্রায় পৌনে দু মাস কেটে গেছে। মিলনের অবস্থা কখনও আশঙ্কাজনক হয় নি। তবে অনিমেষ ও ওলিয়েন্ডারের অন্যান্য ডাক্তারদের চিন্তাও কাটে নি। হঠাৎ একদিন অনিমেষ বাড়ি এসে বলল,

- সব ঠিক হয়ে গেছে, ওলিয়েন্ডার থেকে মিলনকে আমেরিকার নামকরা 'জন হপকিন্স' হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। সঙ্গে আমাকেই যেতে হবে। ওলিয়েন্ডার সমস্ত খরচ দেবে। অবশ্য জন হপকিন্স হাসপাতালও বলেছে যাতায়াত ও থাকার অধিকাংশ খরচটা দেবে। মিলনের কেসটা নাকি চিকিৎসা জগতের একটা সাড়া জাগান রিসার্চ হবে। আমরা পরের সপ্তাহেই রওয়ানা দিচ্ছি। বুঝলে দিয়া, এটাতে আমার নামও অনেক বাড়বে। এখনই তো জন হপকিন্স থেকে বলেছে আমাকে নাকি আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা সেমিনার-এ মিলনের কেসটা নিয়ে পেপারও পড়তে হবে।

- আমি বুঝতে পারছিনা এত বড় একটা খবর আর এমন একটা ডিসিসান আমাকে তুমি না জানিয়ে কি করে নিলে! আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। আমি কিছুতেই এখানে একা থাকতে পারব না।

- আঃ দিয়া, বাচ্চাদের মত কোর না। আমি তো আর বেড়াতে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি অসম্ভব একটা দায়িত্ব নিয়ে। সারাদিন আমি কাজের মধ্যে ভীষণ ব্যস্ত থাকব। তুমি ওখানে গিয়ে কি করবে?

- প্লিজ আমাকে নিয়ে চল। দেখবে ঠিক আমাকে মিস করবে। তখন তোমার খুব খারাপ লাগবে। আর তুমি একা কাজের মধ্যে থাকলে তোমার খাওয়া দাওয়ার কোনো ঠিক থাকবে না। প্লিজ, লক্ষ্মীটি, তুমি, না বোল না।
- দিয়া, কি ছেলেমানুষি করছ বল তো? আমার এখন বেশ টায়ার্ড লাগছে। এ নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

কোথাও একটা রুক্ষতা এই আলোচনায় ছেদ টানল। দিয়া আর একটি কথাও বাড়াল না। বিছানায় শুয়ে আছে দিয়া। পেছন থেকে অনিমেষ একবার জড়িয়ে ধরল দিয়াকে। বলল, ‘আই অ্যাম সরি, দিয়া।’ কোন কথা বেরোল না দিয়ার মুখ থেকে। বাইরের খুব আবছা আলো এসে পড়ছে ঘরে। দিয়ার চোখদুটো নাইট স্ট্যান্ডের ওপর ওদের বিয়ের ছবিটার ওপর। একটু ঝাপসা লাগছে। চেখের কোণে বুঝি একফোঁটা জল কখন বেরিয়ে এসেছে। কত ভালবেসে ওরা বিয়ে করেছিল। ভাল বোধহয় এখনো বাসে দুজন দুজনকে। তবে কমতিটা কিসের? তিন বছর আগে পারত অনিমেষ এমন করতে? বিয়ের আগের এক বছর তো রাত্রে ফোনে একবার কথা না হলে নাকি অনিমেষের ঘুমই আসত না। ওলিয়েণ্ডার-এ পৌঁছে ফোন না করা অবধি দিয়া সোফাতেই বসে থাকত। অথচ এখন কতদিন তো অনিমেষ সারাদিন কোনো ফোনই করে না। দিয়ার কাজকর্ম কিন্তু দিব্যিই চলে। আসলে একেই বলে বোধহয় অভ্যস্ত হয়ে ওঠা। ওরা দুজনেই কি তাহলে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে দুজনের মধ্যের দূরত্বে? অবশেষে এই সব এলোমেলো চিন্তার মধ্যে ঘুম নেমে এল দিয়ার চোখে।

(২)

- এত রাত্রে কে এল? হিয়া, তুমি একটু দেখবে?
- দেখছি।

তখন প্রায় রাত সাড়ে ন-টা। হিয়া আর আনন্দ ডিনার সেরে সবে বসেছে। এমন সময় কলিং বেল। হিয়াই দরজা খুলল।

- একি? দিয়া? তুই? এত রাত্রে? একা? অনিমেষ কোথায়?
- হ্যাঁরে দিদি, আমি একা। ও প্রায় দু-সপ্তাহ হ'ল আমেরিকায়।
- আয়, ভেতরে আয়। তা হঠাৎ? কোনো খবর টবর দিবি তো? আজকাল যা হয়েছে। এত রাত্রে, জানলে তোর জামাইবাবু স্টেশন থেকে নিয়ে আসত। এটা একদম ভাল করলি না। দাঁড়া, খাবি তো?
- হ্যাঁ খুব ক্ষিদেও পেয়েছে।
- আগে খেয়ে নে। তারপর গল্প সল্প হবে।

খেতে খেতে আর গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। আনন্দের কাল অফিস আছে। তাই সে আগেই ঘুমাতে চলে গেছে। হিয়া গেস্ট রুমে বিছানাটা রেডি করতে করতে বলল,

- সত্যি করে বল তো দিয়া, অনিমেষের সঙ্গে কি হয়েছে?
- আর পারলাম না রে দিদি।
- সে তো বুঝতেই পারছি। তবে বিয়ের পরে এরকম তো একটু আধটু

লেগেই থাকবে।

- না দিদি, তুই বুঝবি না। প্রায় গত দু বছর আমি একা। একদম একা। আমার জন্যে ওর কোনো সময় নেই রে। ওর তো ছেলে-মেয়েতেও বড় আপত্তি। উপায় নেই যে আমি কিছু নিয়ে থাকব। আমি খুব একা, দিদি!
- দিয়া, আমাদের বিয়ে প্রায় আট বছর হ'ল। এখনও তো...
- দিদি, জামাইবাবু তোকে কতটা সময় দেয়?
- নে, এখন অনেক রাত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়। কাল কথা হবে।
- দিদি, ভাবছি মায়ের কাছে চলে যাব রে।
- এখন ঘুমিয়ে পড় তো?

আপাততঃ আলো নিভিয়ে চলে গেল হিয়া।

পরের দিন সকালে দিয়া ঘুম থেকে উঠে দেখল - হিয়া বসে আছে ব্যালকনিতে, সামানের টেবিলে টি-পট আর প্লেটে কিছু বিস্কুট। আনন্দ অনেক সকালে অফিসে চলে যায়। হিয়ার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে তাকালে দূরে ট্রেনলাইনটা দেখা যায়। একটা ট্রেনও যাচ্ছে এখন।

- কি রে, ঘুম হ'ল?
- ওই আর কি।
- তোর সত্যি কি হয়েছে বল তো?
- আমি ভাবছি কাল কিংবা পরশু চলে যাব মায়ের কাছে।
- তুই কি তাহলে?
- হ্যাঁ রে দিদি, আর বোধ হয় পারলাম না।
- তা এত শত ভাবনা চিন্তার আগে একবার অনিমেষের সঙ্গে কথা বলে নিলে পারতিস না?
- কি করে বলব বল তো? ও তো কোনো ফোন নম্বরও দেয় নি। ইচ্ছে থাকলেও তো আর উপায় রাখছে কই!
- তুই এখনই কিছু করে বসিস না। মাকে এখনই কিছু বলার দরকার নেই।

দিয়া নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ট্রেনটা চলে যেতে দেখল।

(৩)

- আঙ্কল তুমি আগে কখনো প্লেনে চেপেছ?
- হ্যাঁ
- আমার এই প্রথম। তোমার ক'বার?
- অত মনে নেই।
- দেখ দেখ আঙ্কল, আরেকটা প্লেন। ওটাও মেঘের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। যদি ধাক্কা লেগে যায়।
- লাগবে না।
- কি করে জানলে?
- জানি, মিলনবাবু এখন দেখি তো তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।
- না। তুমি আমার সঙ্গে খেলবে?
- কি খেলব?
- কাটা কুটি।
- আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুমিয়ে নিই।

- তুমি সব সময় এরকম বল। কখনও খেল না। তুমি পচা। তুমি একদম ভাল না।

প্রথম দুটো দিন ভালই ছিল মিলন। তবে বেশ দুর্বল ছিল। ওকে নিয়ে তো সব সময় অনিমেঘের চিন্তা। আজ থেকে ওনার ভীষণ বায়না। কিছুতেই হাসপাতালে যাবে না। সারাক্ষণ শুধু বাড়ি ফিরে যাবার বায়না। দু-ঘন্টা থাকার পর এখানকার ডাক্তাররাই বলল ওকে বেশ 'ডাউন' দেখাচ্ছে। এখানকার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এল অনিমেঘ।

- আমি কিচ্ছু খাব না।
- লক্ষ্মী মিলন, একটু কিছু খেয়ে নাও।
- না, আমি কিচ্ছু খাব না। তুমি আমাকে কেন এখানে নিয়ে এলে? আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।
- দেখ বাবা, তুমি তো এসেছো ভাল হয়ে যেতে। ওরা তোমাকে টেস্ট করে ওষুধ বলে দেবে। আর তুমি যদি না খাও তাহলে তো ওরা টেস্টগুলো ঠিকমত করতে পারবে না।
- না পারক। তাও আমি খাব না। না, না, না। তুমি পচা। তুমি খারাপ।

সারাদিনের ক্লান্তি অনিমেঘের ধৈর্যের ইতি টানল। পারল না অনিমেঘ আর। ছোট্ট একটা কানমলা আর বকুনি দিল মিলনকে। তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মিলন বলতে থাকল - 'আমি খাব না, খাব না, খাব না।' অনিমেঘের মিলনকে দেখে কেমন বেচারি মনে হ'ল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদতে কাঁদতে মিলন ঘুমিয়ে পড়ল। অনিমেঘ ওকে বিছানায় শুইয়ে দিতে দিতে প্রথমবার মনে পড়ল দিয়া বলেছিল, 'দেখবে ঠিক আমাকে মিস করবে।' মনে মনে বলল, 'দিয়া, সত্যি তুমি থাকলে আজ সামলে নিতে।'

একি অনেক বেলা গড়িয়ে গেছে। আজ অনেক্ষণ ঘুমিয়েছে অনিমেঘ। মিলন নিশ্চয়ই উঠে পড়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে অনিমেঘ মিলনের খোঁজে গেল পাশের ঘরে। কিন্তু একি? সারা বাড়িতে মিলন নেই। হঠাৎ অজানা একটা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল। ঠিক যা ভেবেছিল অনিমেঘ। সামনের দরজাটা খোলা আর শুধু ভেজিয়ে রাখা। পাগলের মত অনিমেঘ ছুটে বেরল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে ছুটে গেল সামনের পার্কটায়। কাল পার্কের দোলনায় দোলার বায়না করেছিল মিলন। অনিমেঘ না করে দিয়েছিল। ছেলেটার খুব অভিমান হয়েছিল। নাঃ পার্কের কোথাও মিলনকে পাওয়া গেল না। তাহলে তো একটাই উপায়। পুলিশে খবর দেওয়া। সেই কর্তব্যের খাতিরেই ছুটে ছুটে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দেখল, মিলন শুয়ে আছে সিঁড়ির ওপর। বেহুঁস প্রায়। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

সারাদিন অনিমেঘ মিলনের পাশেই বসেছিল। ঠিক সময় ধরে ওষুধ দিয়েছে। বিকেলের দিকে জ্বরটা অনেকটা কমল। জ্বরের ঘোরে মিলন অনেকবার মাকে খুঁজল। মনে হচ্ছে অনিমেঘের, কি ভুলই না করেছে। সারাদিন আজ দিয়ার কথা এত মনে হয়েছে। কত বার তো ফোনও করল। বাড়িতে কি কেউ নেই? কোথায় গেল দিয়া? অনেক চিন্তাও হচ্ছে দিয়ার জন্যে। কিন্তু এত দিন পরে, আজ হঠাৎ দিয়ার কথা এত মনে পড়ল কেন? ক্ষণে ক্ষণে কানে যেন বলে যাচ্ছে, 'দেখবে আমাকে ঠিক মিস করবে।' আর অনিমেঘের মন বলে চলেছে, 'করছি, করছি করছি।' দিয়া সঙ্গে এলে কি আজ মিলনের এই দশা হ'ত? 'দিয়া, এই মুহুর্তে তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। আর দরকারের

সময়েই তোমার কথা মনে পড়ল। আমি খুব খারাপ না? কিন্তু বিশ্বাস কর আমি তোমায় সত্যি মিস করছি। তুমি কি আমায় মিস করছো দিয়া? আমি না ...'

- আফল?
- কি বাবা?
- তুমি না খুব ভাল!
- তুমি এখন কেমন আছ, মিলন?
- আফল, তুমি না ঠিক আমার বাবার মতন। আমার যখন অসুখ করে, বাবা তখন সব সময় মাথার কাছে বসে ঠিক তোমার মত করে জলপাট্টি দেয়। জান...
- মিলন, তুমি একটু চুপ করে বিশ্রাম করে নাও। তাহলে তোমার শরীরটা তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে।
- আমি তো এখন ঠিকই হয়ে গেছি!
- প্রায় ঠিক। তবে এখনও একটুখানি বাকি।
- খুব একটু?
- হ্যাঁ

মিলন খুশী হ'ল শুনে। এর পর মিলনকে সামলাতে অনিমেঘের কোনো বেগ পেতে হয় নি। পরের এক সপ্তাহ ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটল। মিলনের সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে গেল। এই এক সপ্তাহে অনিমেঘ বার চার পাঁচেক বাড়িতে ফোন করে দিয়ার কোনো খবর পায় নি। এমন কি দিল্লীতে দিয়ার বাপের বাড়িতে ফোন করেও কোনো খবর পেল না অনিমেঘ। যাই হোক টালমাটাল মনের অবস্থার মধ্যেই ভেবে নিল, আর তো ঘন্টা কয়েক। তারপরেই তো দেশে ফিরে যাবার ফ্লাইট ধরবে ওরা। ভাবতেই কেমন ভাল লাগল অনিমেঘের। কতদিন দিয়াকে দেখে নি। গত কাল সারাদিন দিয়ার জন্যে অনেক শপিং করেছে অনিমেঘ।

(৪)

ওলিয়েণ্ডার থেকে গাড়ি এসেছিল অনিমেঘকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্ট থেকে। একি আশ্চর্য! চারিদিকে তাকিয়েও কোথাও দিয়াকে দেখতে পেল না। বড় আশা করেছিল অনিমেঘ। ইচ্ছে করছে ছুটে বাড়ি যেতে। কিন্তু ওলিয়েণ্ডারে মিলনকে নিয়ে ছেড়ে আসতে না পারলে তার একটা বড় দায়িত্ব যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অগত্যা চলল ওলিয়েণ্ডারের পথে।

সমরদা এসে একটা বড় প্যাকেট দিয়ে বলল - 'এটা রেজিস্ট্রি করে পঠিয়েছে তোমার নামে। এই ঠিকানায়া।'

প্যাকেট খুলে অনিমেঘ চিঠিটা পড়ল -

'আমি আর পারলাম না, অনিমেঘ। তোমার কোনো ফোন পাই নি, আর তোমার কোনো ঠিকানা জানা নেই। তাই ওলিয়েণ্ডারেই চিঠিটা পাঠালাম। জানি তুমি ওখানে আসবেই। আমি মায়ের কাছে চলে যাচ্ছি। সঙ্গে একটা ডিভোর্সের ড্রাফ্ট পাঠালাম। ভাল থেক। ইতি দিয়া।'

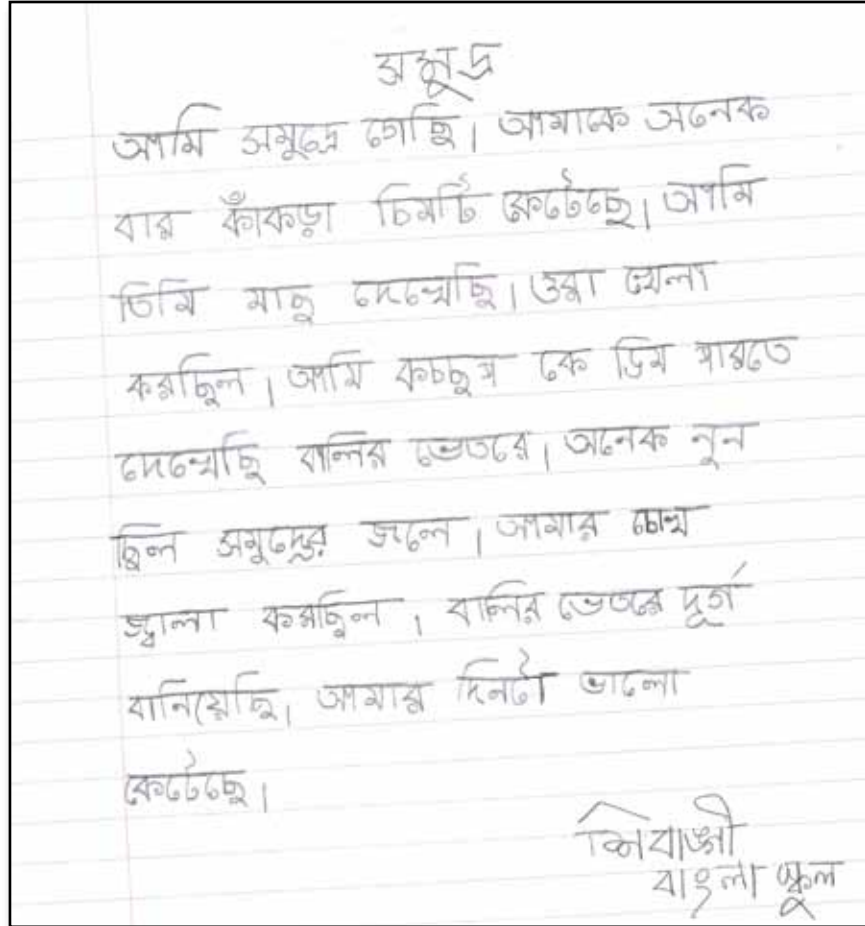
- আর পারলাম না গো। চলে এলাম তোমার কাছে। ওলিয়েণ্ডার থেকে জেনে নিয়েছিলাম তোমার ফ্লাইট ডিটেইলস্।

অবসন্ন অনিমে কখনো রকমে টলতে টলতে বাড়ি পৌঁছাল। ঢোকান মুখে দারোয়ান জানিয়ে দিল যে দিদিমনি বেশ কয়েকদিন হ'ল বাড়ি নেই। ঘরে ঢুকে মনেই হ'ল না যে দিয়া অবর্তমান। বোধহয় অনিমেষের জন্যে বাড়িটা নিখুঁত ভাবেই সাজিয়ে রেখে গেছে দিয়া। শোবার ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে মন হাঙ্কা করা কান্নায় বার দশেক দিয়ার চিঠিটা পড়ে ফেলল অনিমে। কেন চলে গেলে দিয়া? আমি যখন তোমায় বুঝতে পারলাম তখনই চলে গেলে? হঠাৎ যেন সেই চেনা গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল। এ তো দিয়ারই সুবাস। কত বার বোকার মত অনিমে জিজ্ঞেস করেছে, 'তোমার এ গন্ধটা কি শ্যাম্পুর না পার্ফিউমের?' দুটু হেসে দিয়া বলেছে, 'ভালবাসার।' কাঁদতে ইচ্ছে করছে আজ সারারাত অনিমেষের। কিন্তু একি, এ গন্ধটা তো এবার সত্যিই ঘরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকাল একবার অনিমে, হয় তো ডাইনিং টেবিলটা গোছাচ্ছে দিয়া।

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে অনিমে। হাতে এখনও ধরা সেই খামটা। আবার কানে গেল -

- চাইলে ওটা ছিঁড়ে ফেলতে পার।

এই মুহুর্তে অনিমেষের দিয়াকে জড়িয়ে ধরে টেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, 'চাই, চাই, চাই।' ❀



চেনা... চেতনা

জয় ব্যানার্জী

খোয়ালী মেয়ের মত আঁকা বাঁকা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে। দূরে দুর্গের পরিখা ঘেরা ছোট শহর রাভেনসবুর্গ। ইউরোপের মধ্য যুগে এই শহর স্থাপিত হয়েছিল হয়ত। প্রান্তরে এক পশলা মোমরং বরফের প্রলেপ। লোকজন তেমন নেই। ফ্রেমে-বাঁধা ছবির নীরবতা।

ক্যামেরা কাঁধে নামতে নামতে কখন চলে এসেছি পরিখার পাশেই। চার কোণে ক্ষুধার হাঁ-এর সমান চারটে দরজা.... শহরের প্রবেশ পথ। ঐ পথে লোহার বর্মে মুখ ঢাকা কত ঘোড়সওয়ারের আনাগোনা হয়েছে এককালে; খুড়ের তালে তর্কের মতন প্যাঁচানো ধুলো উড়েছে; শূন্যঘরের জানলায় অপেক্ষমান তরুণীর চোখের জলে ঐ ধুলির প্রতিবিশ্ব... ঘোড়সওয়ার নিজের খোয়ালেই চোখ তুলে চেয়েছে জানলায়; বর্মের ভেতর বন্ধ মনের নিশানা কোনদিনই পৌঁছায়নি ঐ তরুণীর চোখে। যাক্ সে আজ অনেক দিনের পুরনো রূপকথা!

এমনি এক বিশাল দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তেই চিত্রপট পাল্টে গেল। বাইরের নির্জনতা আর নেই। গাড়ী ঘোড়া লোকজনের কর্মমুখর শ্রোত, দোকান বাজার কলকারখানা, সব মিলে এক চলমান পৃথিবীতে ফিরে এলাম। হ্যাঁ, ...বাইশ বছর আগে এই শহরতলীতেই কত ঘোরাফেরা করেছি। কারখানায় কাজ করতাম; সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আর কিছু করার থাকত না; বাইরে বেড়িয়ে পড়তাম রোজ। একই চেনা পথে, পার্কে, সংক্ষিপ্ত ডাউনটাউনে অকারণে বারবার ঘুরপাক খেতাম দুর্বল যুক্তির মতন। ছোট শহরে সন্ধ্যার পর লোকজনের চলাফেরা কম; ঐ বয়সে নিজেকে বড় একা মনে হ'ত। যুদ্ধফেরৎ সেনানীর কাটা হাতের উপর ঝলমলে জামার হাতার নিঃসঙ্গতা।

এইসব পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি। চেনা শহর হ'লেও দীর্ঘ বাইশ বছরে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ী, পাতাল পুরীতে গাড়ী রাখার ব্যবস্থা ... এসব আগে ছিল না। লোকজনও বেড়েছে। ঠিক চিনেও চেনা যায় না রাস্তাঘাট। চলতে চলতে মনে হয় আমি যেন অনেক দিন পরে ফিরে আসা কাবুলীওলার চোখে মিনিকে দেখছি। আধ অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছি - হটাৎ রাস্তাটা এক বাঁকের মুখে এসে পড়ল। আর পার হবার প্রয়াসে চোখ তুলতেই ওপারের দেওয়ালের সাইনবোর্ডটা আমার চেতনায় সপাং শব্দে চাবুক চালিয়ে দিল। তারই নীচের দোকানের আধখোলা দরজাটা নির্লজ্জের মত দাঁত বার করে ভেংচে উঠল। বাইশটা বছর স্প্রিং এর মত নিমেষে সংকুচিত হ'য়ে গেল।

“গাষ্ট্‌হোফ হারমনি।” স্মৃতি শিহরিত হয়ে উঠে মন। আবেগের বশেই রাস্তা পার হয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম। টেবিলে টেবিলে জার্মান যুবক যুবতীদের খুশীর হাসিতে কর্পুরের স্পর্শ। গেলাসে গেলাসে বিয়ারের আমন্ত্রণ। আজ থেকে বাইশ বছর আগে এমনি এক জমাটি সন্ধ্যায় এই বিয়ার পার্লামে

মারিয়া মেস্‌মারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। কালো চুল, কালো চোখ, হালকা মাখনের মত চাপা রং। জার্মান বলে মনেই হ'ত না; ইটালীয়ান বা গ্রীক বলে ভুল হ'ত। বিয়ার পার্লামের জমাটি আড্ডায় আমাদের আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়। তারপর প্রায়ই সন্ধ্যায় দেখা হ'ত। ‘হারমনি’ থেকে বেরিয়ে কতবার ওকে এই পথে পৌঁছে দিয়েছি। বোকার মতন সময়কে অগ্রাহ্য করে কত সন্ধ্যায় এই শহরেরই সংক্ষিপ্ত পরিবেশে আমরা দুজনে এলোমেলো হাওয়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছি। যৌবনে সময়ের দাম নেই। অধিক ঘনিষ্ঠ হয়ে জড়িয়ে ধরলে মারিয়া চোখ তুলে দুষ্ট হেসে বলত, “ছেড়ে দাও, লোকেরা দেখলে বলবে কি!” আমি সংকুচিত হয়ে উত্তর দিতাম, “আমি বিদেশী বলে তোমার লজ্জা।”

এইসব চিন্তা করতে করতে একটা টেবিলে বসব কিনা ভাবছি, এমনি সময়ে দূরে একটা টেবিলে নজর পড়ে গেল। ছ'সাতটি অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের মাঝখানে কালো ভেলভেটের জামা পরা মধ্যবয়সী এক ভদ্রমহিলা। হ্যাঁ, মারিয়ারও কালো পোশাকের দিকে ঝোঁক ছিল। তার চুল আর চোখের রঙের সঙ্গে মানাতো ভাল। হয়ত আজ আর চুল অত লম্বা নেই; বাঙালী মেয়েদের মতন মাথার মাঝখানে সিঁথির দুধারে ঘন কালোর চেউয়ে হয়ত বা সাদার পরশ পড়েছে আজ। তবে রং নিশ্চয়ই বদলায়নি।

সোজাসুজি না হ'লেও দূর থেকে আলোর রিফ্লেক্সনে ভদ্রমহিলার সাইডভিউটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। যেমন সেই একই ঝুঁকে পড়ে বসার ভঙ্গি; সেই একই বাঁ হাতে বিয়ার গ্লাস ধরার কায়দা; সেই একই হাসি। দ্বিধা জড়ানো লাজুক মেয়ের হাসি।

হটাৎ ভদ্রমহিলা পাশ ফিরে এদিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। ও হয়ত আমায় দেখতে পেলেও লক্ষ্য করে নি। আমি কিন্তু মুহূর্তের চাউনিতেই তাকে চিনে নিয়েছি। মুখে তার আগের সেই ‘স্পার্ক’ আর নেই; দৃষ্টিতে সৃষ্টির নেশাও নেই। দীর্ঘ বাইশ বছরে জীবনের নানান পরিক্রমায় মুখে আজ উত্তরের চেয়ে প্রশ্নই বেশী।

আমি আর বসলাম না। কোন টেবিলে চেনাশোনা মুখও নেই। আবার সেই আধ ভেজানো বিকৃত মুখের মতন দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে হোটেল ফেরার পথে এলোমেলো চিন্তার মাঝে কেবলই ঐ মুখটা ভেসে উঠছিল। আচ্ছা, এই কি সেই মারিয়া মেস্‌মার, না অন্য কেউ হবে? বয়সের সঙ্গে আমারও দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে; আমারও তো ভুল হতে পারে! কিন্তু ভদ্রমহিলার কপালের ঠিক মাঝখানে গভীর ক্ষতের দাগটা? ওটাকে অস্বীকার করি কি করে? ওটা তো আমারই সৃষ্টি! ৭

মুস্কিল আসান

পরশর শর্মা

কাঁথি কলেজ থেকে বি এ পাশ করে কানাই বেরা ঠিক করল পরের চাকরি করার দাসত্ব আর করবে না। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবে। কি ব্যবসা করবে ঠিক করতেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। ছেলেবেলা থেকে শরদিন্দুর ব্যোমকেশ আর নীহাররঞ্জনের কিরীটি গুলে খেয়েছে। দু একটা শারলক্ হোমস আর আগাথা ক্রিস্টির অনুবাদ যে পড়েনি এমন নয়। সুতরাং ঠিক করল গোয়েন্দাগিরি করবে। স্বাধীন ব্যবসা, লোক ঠকিয়ে নয়, রীতিমত বুদ্ধি খরচা করে বেঁচে থাকা। কানাই বেরার বাড়ীর অবস্থা খারাপ নয়, বরং বেশ ভালই। বাবা বেশ কিছু জমি জায়গার মালিক। সর্বহারাদের পার্টি ওকে বলে জোতদার। বড় ভাইয়ের কয়লা আর মেজোর কেরোসিনের ডিলারশিপ। বাবা আভা মাইতির পার্টির লোক, ওনার সঙ্গে বেশ দহরম মহরম ছিল। তাই এ গুলো পেতে কোন অসুবিধে হয় নি। সংসারের কোন চাপই ছিল না কানাই-এর ওপর। সুতরাং সখের গোয়েন্দা হতে ক্ষতি কি! বাবার বন্ধু মতি সাউর বাজারে বেশ বড় গোলদারী ব্যবসা। তার একটা খালি বাড়ী পড়ে ছিল বাজারের সামনে। তারই একটা ঘরে চারটে চেয়ার আর একটা টেবিল নিয়ে কানাই তার গোয়েন্দা অফিস খুলে ফেলল। অ্যাসিস্ট্যান্ট করল স্কুলের বন্ধু প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার বলাইকে।

সাইনবোর্ড লাগাল ‘মুশকিল আসান’। সাইনবোর্ড দেখে লোকে কিছু বুঝতে পারল না প্রথম প্রথম। পরে নীচে লিখল, ‘প্রাইভেট ডিটেকটিভ, সুলভে সব রকম সমস্যার সমাধান করা হয়’। ‘মুশকিল আসান’-এর নাম আস্তে আস্তে লোকে জানতে পারল। কিছু কিছু কেসও আসতে লাগল। তবে কেস গুলো দেখে কানাই ভাবল, দূর এসব আমার দ্বারা হবে না।

একজন এসে বলল, আমার কালো গাইটা দশ লিটার দুধ দিত রোজ, ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। আর একজন বলল, আমার মুরগীটা রোজ পাশের বাড়ীতে গিয়ে ডিম পেড়ে আসছে, ওরা ডিম ফেরৎ দিচ্ছে না।

কি যন্ত্রণা! আরে মশাই, এগুলো তো পুলিশের কাজ। আমি আপনাদের গরু মুরগী পাহারা দেব? এসব আমার দ্বারা হবে না।

তবে যে লিখেছেন, সব রকম সমস্যার সমাধান করা হয়।

ঠিকই, তবে এগুলো নয়। যেমন কোন মার্ডার কেস পুলিশ সমাধান করতে পারছে না; কারোর মণিমুক্তা বসানো গয়না হারিয়ে গেছে; অন্য শহর থেকে মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে, ছেলের খোঁজ খবর নিতে হবে। এইসব কেস আমি করি। এই ভাবেই চলতে লাগল।

একদিন শনিবার সকালে কানাই সবে অফিস খুলে পাশের দোকান থেকে আনা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। বলাই এসে ঢুকল।

কি গুরু, কেস টেস কিছু এল?

আরে আসবে। এসব ব্যবসা জমতে সময় লাগে।

মার্ডার আর গহনা চুরির বাজারটা একেবারে ডাউন হয়ে গেল। ছিঃ, ছিঃ,

দেশটার কি হাল হল! বলতে বলতে সামনের দরজা দিয়ে একজন ঢুকলেন। বয়স তিরিশের নীচেই। পরনে পরিষ্কার পাজামা আর গেরগ্যা পাঞ্জাবী। আসতে পারি?

আসুন।

এটাই কি মুসকিল আসানের অফিস?

হ্যাঁ, আমি কানাই বেরা, চীফ ডিটেকটিভ। ইনি আমার সহকারি বলাই পাণ্ডা। আপনার পরিচয়?

আমি মাধব সাহা। মেদিনীপুর শহরে থাকি। ওখানেই একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করি।

বেশ, আপনার কি সমস্যা?

একটু গোপনীয়, ওনার সামনে বলতে পারি?

ইনি আমার সহকারী। এর সামনে সব কিছু অকপটে বলতে পারেন। এই যে মতি সাউর দোকানের ক্যালেন্ডার দেখছেন। কি দেখছেন, সততাই আমাদের মূলধন। আগামী বছর মুসকিল আসানের ক্যালেন্ডার বের হবে। লেখা থাকবে গোপনীয়তাই আমাদের মূলধন। বলুন, কোন সমস্যা হবে না।

আমরা ওপার বাংলার লোক। দাঙ্গার সময় বাবা মা আর এক পিসীর সঙ্গে এপার বাংলায় চলে আসি। আমি তখন খুব ছোট। কিছুই মনে নেই। মা আর পিসীর কাছ থেকে শুনেছি।

কেন, বাবা?

সেটাই আমার সমস্যা। শুনেছি এ বঙ্গে আসার কিছুদিন পর বাবা চাকরি খুঁজতে যাচ্ছি বলে সেই যে বের হয়ে যান আর কোন দিন ফিরে আসেন নি। মা আর পিসী অনেক কষ্ট করে আমায় মানুষ করেন। মা মারা যাবার পর পিসীর কাছেই ছিলাম। তিনিও মারা গেছেন কিছুদিন হ’ল। আমি একা। কেন বিয়ে থা করেন নি?

না, তবে করার ইচ্ছে আছে।

আপনার সমস্যাটা কী? হবু স্ত্রীর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া, না নিরুদ্দেশ বাবাকে খুঁজে বের করা।

ঠিক তা নয়। তবে শেষেরটার কাছাকাছি।

তার মানে?

কিছুদিন আগে একদিন এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে খোকা খোকা বলে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি তোঁর বাবা। আমায় ক্ষমা কর। চেহারাটাতে আমার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। কাকে আর জিজ্ঞাসা করব? মা আর পিসী তো গত হয়েছেন। আমার তো ভেরিফাই করার মত কেউ নেই। আমি মেদিনীপুর শহর থেকে মাইল খানেক দূরে একটা ভাড়া বাড়ীতে থাকি। ওখানেই উনি রয়েছেন আমার সঙ্গে। আর একটা একটা কাজের ছেলে আছে। খুচখাচ কাজ করে দেবার জন্য। আমি নিজের বাবা মনে করে আশ্রয় দিই। কোথায় বা যাবেন এই ভেবে। এখানে উনি বেশ আছেন। খাওয়া

দাওয়ার কোন অভাব নেই। তার ওপর ফাই ফরমাস খাটার জন্য ছেলেটা তো রয়েছেই। হাত খরচার জন্য সপ্তাহে পঁচিশ টাকা দিই। কিন্তু দিন দিন ওনার আচার আচরণ আমার ভালো ঠেকছে না। কাজের ছেলেটা বলল দুপুরে উনি মদ খান। তার ওপরে গাঁজা পান বিড়ি তো আছেই। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ইনি আমার বাবা নন। ঠগ জাতীয় কিছু।

আপনার এগুলো মনে হচ্ছে কেন? কানাই জিজ্ঞাসা করল। ঠিক বলতে পারব না। তবে আমার মনে হচ্ছে। তাই এসেছি লোকের মুখে আপনার কথা শুনে। আমাকে কি করতে হবে?

উনি আমার সত্যিকারের বাবা কিনা সেটাই আপনাকে বার করতে হবে। যদি হ'ন ভাল, ইনি আমার কাছে থাকবেন। আর যদি না হ'ন তাহলে ওনাকে চলে যেতে হ'বে।

সব শুনে কানাই বেরা কিছুক্ষণ ভাবল।

দেখুন আমার অবস্থা খারাপ নয়। ব্যাঙ্কে ভাল চাকরি করি। আপনার ফিস এবং অন্য সব খরচ আমি দেব।

সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার হাতে সিকো ঘড়ি আর পকেটে পার্কার পেনটা দেখে। ঠিক আছে আপনার কেসটা নিলাম। একশ' টাকা আগাম দিয়ে যান। কাজ হ'লে আরও চারশ' দেবেন। কাজ যদি না করতে পারি এই একশ' টাকা ফেরৎ নিয়ে যাবেন। সোমবার দিন আমাকে ফোন করবেন কি করতে হবে বলে দেব। আর আপনার বাবাকে ঘৃণাক্ষরে জানতে দেবেন না আপনি ওনাকে সন্দেহ করছেন। আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা আর মেদিনীপুর সদর বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটা ডিরেকশান দিয়ে যান।

বেশ আজ উঠছি। এই আপনার আগাম একশ' টাকা, ঠিকানা, আর ডিরেকশান রইল। নমস্কার।

মাধব সাহা অফিস থেকে বের হয়ে গেল।

গুরু কেসটা তাহ'লে নিলে, বলাই বলল।

নিলাম তো বটে। তবে মগজটা একটু খাটাতে হবে মনে হচ্ছে।

সোমবার মাধব নির্দেশমত ফোন করল। কানাই ওকে সব বুঝিয়ে দিল কি করতে হবে আর জেনে নিল সকালে কতক্ষণ ওর বাবা বাড়ীতে থাকে। মঙ্গলবার সকালে মেদিনীপুর সদর বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটা সাইকেল রিকসা ভাড়া করে কানাই মাধবের বাড়ী এল। একটা একতলা বাড়ী, নতুন না হ'লেও একেবারে পুরানো নয়। কড়া নাড়তে একটা তের চোদ্দ বছরের ছেলে দরজা খুলে দিয়ে বের হয়ে গেল মাধবকে দেওয়া নির্দেশ মত। পায়ে পায়ে একটা ঘরের সামনে এসে কানাই ডাকল, রসময়বাবু আছেন?

কে, বলে একজন বেরিয়ে এল। আমিই রসময়। আপনি কে? কি চাই আপনার?

আরে রাগটাগ করবেন না। আমি বাধ্য হয়েই এসেছি হাসপাতাল থেকে। ওখানকার ল্যাবরেটরির এ্যাসিস্টেন্ট। আপনার ছেলে মাধবের আজ সকালে অফিস যাবার সময় একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। একটা ট্রাক ধাক্কা মেরে পালিয়েছে। ওর অবস্থা খুব খারাপ। জীবন নিয়ে টানাটানি চলছে। এখনই চার পাঁচ বোতল রক্ত চাই। হাসপাতালে ওর গ্রুপের রক্ত নেই। ওরা খজাপুরে ফোন করেছিল, ওখানেও নেই। আপনি ওর বাবা, আপনার রক্ত ওর গ্রুপের সঙ্গে মিলবে। আপনি ছাড়া আপনার ছেলের জীবন আর কে বাঁচাতে পারে? তবে চার পাঁচ বোতল রক্ত দিলে আপনার জীবন সংশয় হ'তে পারে।

সেটা আর এমন কি, কি বলেন? আপনার তো বয়েস হয়েছে। আপনার

ছেলের জীবনটা তো বাঁচবে। আপনি আর দেরী করবেন না। একটা সাইকেল রিকসা নিয়ে হাসপাতাল চলে যান। তা না হলে নার্স অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এখানে এসে রক্ত নিয়ে যাবে।

রসময় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, আপনি যান, আমি হাসপাতালে যাচ্ছি।

কানাই বাড়ী থেকে বের হয়ে একটু দূরে গিয়ে আড়াল থেকে বাড়ীটার দিকে নজর রাখল। দেখল রসময় হাতে একটা সুটকেস নিয়ে হাসপাতালের দিকে না গিয়ে সোজা রেল স্টেশনের দিকে পা চালাল। পরের দিন মাধবের ফোন। মাধব ফোনে জানাল রসময় একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। একটা চিঠি রেখে গেছে।

‘মাধব, আমি তোমার বাবা নই। আমার নামও রসময় নয়। তোমার বাবার সঙ্গে হাওড়ার একটা জুটমিলে কাজ করতাম। তোমার বাবা মারা যাবার সময় তোমাদের সম্বন্ধে সব কিছু বলে যান। তাই লোভ সামলাতে না পেরে তোমার বাবা সেজে আসি।’

পরের শনিবার যথারীতি মুসকিল আসানের অফিসে কানাই আর বলাই বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।

গুরু, কি করে কেসটা সলভ করলে?

আরে, অনেকদিন আগে দেখা একটা ইংরাজি সিনেমা থেকে একটু পালটে বেমালাম টুকে মেরে দিলাম।

কি রকম, গুরু একটু খুলেই বল।

তোর মনে আছে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার পর কোলকাতায় গিয়েছিলাম মাসীর বাড়ী। মাসতুতো দাদার সঙ্গে একদিন ৬৫ পয়সার লাইন মারলাম লাইট হাউসে। ‘সোলোমান আর শেবা’ চলছিল।

তখনদার দিনে বেশ গরম বই। ইউল ব্রেনার আর জিনা লোলোব্রিজিডা। রাজা সোলোমানের কাছে দুজন মহিলা একটা ছোট বাচ্ছা নিয়ে এসে একজন বলল, এ আমার বাচ্ছা। অন্যজন বলল না, এটা আমার বাচ্ছা। রাজা সোলোমান সেনাপতিকে ডেকে বলল তলোয়ার দিয়ে বাচ্ছাটাকে দু টুকরো করে দুজনকে এক টুকরো করে দিয়ে দাও। শুনে এক মহিলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন তাপ উত্তাপ নই। অন্যজন সোলোমানের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল বাচ্ছাটাকে কেটো না। ওকেই দিয়ে দাও। আমার চাই না।

সোলোমান বুঝতে পারল কে আসল মা। ছেলেটাকে তাকে দিয়ে অন্যজনকে জেলে পাঠাল।

ঐ এক থিয়োরিতেই বাজী মাং করলাম। বুঝলি ব্যাবসা জমল বলে।

বলতে বলতে দরজা দিয়ে মাধব ঢুকল। হাতে এক বাক্স সন্দেশ আর একটা খামের মধ্যে চারটে একশ' টাকার নোট।

কি প্রবলেম সলভ তো? কানাই বলল মাধবের দিকে চেয়ে।

হাঁ, আমি আপনার কাছে থ্রেটফুল।

আপনার বাবা সেজে এসেছিল তার চিঠিটা সঙ্গে আছে নাকি?

আছে, এই তো দেখুন।

কানাই চিঠিটা নিয়ে বলাইকে পড়তে দিল।

একটা কপি পেতে পারি? কানাই বলল।

নিশ্চয়। আমি কপি করে পাঠিয়ে দেব।

আজ তাহলে উঠি। বারোটোর বাসটা ধরতে হবে।

হ্যাঁ, আপনি আসুন। তাহলে মালতী সামন্তকে বিয়ে করছেন কবে?

আপনি নামটা জানলেন কি করে?

ভৌতিক

সুব্রত মজুমদার

“আপনি ভূত দেখেছেন?”

আমি জানি না আপনারা কি উত্তর দেন, আমি শুধু তাঁদের বলি, “আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। না, আমি ভূত দেখিনি।” তবে আমি কখন তাদের বলি না যে আমি এমন একটা ঘটনার কথা জানি বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, অন্তত আমার বুদ্ধিতে তো নয়ই।

আজ আপনাদের সেই ঘটনার কথাই বলব, দেখা যাক আপনারা কি সিদ্ধান্তে আসেন।

আমি এটাকে গল্প বলছি না, ঘটনা বলছি, কারণ এটা ঘটেছিল, আর ঘটেছিল আমার সামনেই। আচ্ছা এমন কখন হয়েছে যে আপনি একজনের সঙ্গে আগের দিন কথা বলেছেন অনেকক্ষণ ধরে আর পরের দিনই শুনলেন যে সে হটাৎ মারা গেছে। এটা যে কি অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা তা বোঝানো যাবে না। আমার হয়েছিল। লোকটার নাম ছিল স্টিভ। মিডিল ইষ্টের কোনও একটা দেশ থেকে এসেছিল আমেরিকায়, আমাদেরই মতন ভাগ্যের সন্ধানে। স্টিভ বয়সে আমার থেকে একটু ছোটই হবে। দেখতে খুবই সুন্দর, লম্বা, চালাক চতুর ও খুবই চটপটে। অল্প দিনের মধ্যেই অফিসের সবাইকার সাথেই বেশ ভাবসাব করে নিয়েছিল। স্টিভের বউয়ের নাম নর্ম্যা, আমেরিকান, স্টিভের সঙ্গে কলেজ থেকেই আলাপ। ওদের একটি ছেলে, তিন বছরের, নাম জন। নর্মার দ্বিতীয় সন্তানের প্রেগন্যান্সি খুব এডভান্স স্টেজে। স্টিভের বাড়ীটা এমনিতেই খুব সুন্দর আর নর্মার ফেণ্ড ফেৎসুইয়ের ছোঁয়াচ লেগে সেটা যেন মডেল হোমের মত লাগত।

স্টিভের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ব্রেক ফাস্টে, সকাল বেলা কফি খেতে খেতে। ও বলছিল উইক এন্ড ও আর ওর আরেক বন্ধু মিলে গিয়েছিল “ডায়ার হান্টিং” করতে। খুব গর্ব করে বলছিল ও একটা হরিণ মেরেছে। স্টিভ আবার বন্দুক ব্যবহার করে না, তীর আর ধনুক ব্যবহার করে। ওর ধারণা তাতে নাকি পশুকে একটু সুবিধা দেওয়া হয়। ওর আরও ধারণা, তাতে নাকি বীরত্বও একটু বেশী অর্জন করা যায়। খুব গর্বের সঙ্গে বলছিল যে যদিও দিনটা খুব

ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল, ও শুধু শব্দের ওপর ভরসা করে যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেইদিকে তীরটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। আর হরিণটা সেই তীরেই ঘায়েল হয়েছিল। স্টিভ যখন আধমরা হরিণটার কাছে গেল, দেখল তীরটা কোমরের কাছে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। হরিণটা ছটফট করছে, এত রক্ত যে জায়গাটা লাল হয়ে গেছে। দেখল দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওর সঙ্গিনী হরিণীটি, দেখে মনে হচ্ছিল বাচ্চা হবে যে কোনদিন। আরো দেখল একটা বাচ্চা হরিণ তার মার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি করবে বুঝতে পারছে না। স্টিভ বলল যে দয়া পরবশ হয়ে ওই দুটোকে আর মারে নি। স্টিভের কথা শুনে কি রকম গাটা ঘিনঘিন করতে লাগল, আর শুনতে ইচ্ছা করছিল না। খুব জানতে ইচ্ছা করছিল সেই আধমরা হরিণটার কি হল। স্টিভ কি আর একটা তীর ছুঁড়ে তার প্রাণটা বের করে দিল? না ছুরি দিয়ে তার গলাটা কেটে দিল? প্রায় মাঝপথে স্টিভকে থামিয়ে দিয়ে আমি একটা জরুরী কাজের বাহানা দিয়ে ওখান থেকে সরে এলাম।

চেয়ারে বসে ভাবছিলাম আচ্ছা ওই হরিণীটির কি হবে? আর বাচ্চা হরিণটাই বা কি করবে? মনকে বোঝালাম ওরা তো জঙ্গলে থাকে, ওরকম হয়েই থাকে। তীর লেগে না মরলে ওকে হয়ত কুগারে খাবে বা অন্য কিছু হবে। “সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট” এর দোহাই দিয়ে নিজেকে কোনমতে সান্ত্বনা দিলাম। কাজে মন বসাতে পারলাম না। অফিস ছুটি হওয়াতে মনে হল বেঁচে গেলাম। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক।

আমার অফিস বাড়ির থেকে ৮৫ মাইল দূরে। রোজ পাঁচটায় উঠতে হয়, আর ছটার মধ্যে আমাদের গাড়ি হাইওয়ে ধরে অফিসের দিকে ছুটতে থাকে। আমাদের বলছি এই কারণে যে সাধারণত আমরা কারপুল করে যাতায়াত করি। কিন্তু যে দিনটার কথা বলছি অর্থাৎ স্টিভের সঙ্গে কথা বলার পরের দিন আমার একটা ভোর বেলায় জরুরী মিটিং থাকার জন্য আমাকে ওই দিন একাই গাড়ি চালাতে হয়েছিল। বৃষ্টি সবে পড়তে শুরু করেছে। গাড়ি যখন হাইওয়েতে পড়ল আমি “এন পি আর” রেডিও স্টেশনটা অন করলাম। শুনতে পেলাম সময় সকাল ছটা, প্রবল বর্ষণ ও ঘন কুয়াশার সন্ধান। খুব সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালানোর সাবধান বানীও শুনলাম। কিছুটা যাওয়ার

পর বৃষ্টির তেজটা আরও বাড়ল, তার সঙ্গে বাড়ল কুয়াশার ঘনত্ব। সামনেটা ভাল করে দেখতে না পাওয়ার জন্য গাড়িটা আস্তেই চালাচ্ছিলাম। মনে মনে ভাবলাম ভালোই হয়েছে একটু আগে বেড়িয়ে। প্রায় ৬৫ মাইল হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার পর একটা এক্সিট নিতে হয়। পার হতে হয় একটা ছোট শহর। এই ছোট শহরটা পার হওয়ার পর যে ষ্টপ সাইনটা থাকে সেখান থেকে আমাদের অফিস পৌঁছতে বাকি থাকে আর ১২ মাইল। আমেরিকার যে কোন ছোট শহরের মতই এই শহরটা। আজ ছোট শহরটার ওপর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, শহরটাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছিল। শহরটা ঘুমিয়েই থাকে প্রতিদিন আমরা যখন যাই ওর ওপর দিয়ে। ল্যাম্পপোস্টের টিম টিমে আবছা আলোয় আজ কেমন যেন মনে হচ্ছিল নিবুমপুরী। মনে হচ্ছিল একটা ভৌতিক পরিবেশ যেন শহরটাকে ঘিরে রেখেছে।

ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে গাড়িটাকে সাবধানে চালিয়ে কখন যে ছোট শহরটা পার হলাম মনে নেই। হটাৎ দেখি ষ্টপ সাইনটার কাছে এসে গেছি। ষ্টপ সাইনটার পরে যে রাস্তাটা পড়ে সেটা খাড়াই, আর দুদিকে খাদ। নজর শুধু রাস্তাতে রাখলেই হবে না, চোখ রাখতে হবে সামনে যেন কোন জন্তু জানোয়ার এসে না পড়ে। এই অবস্থার জন্যেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল। সেইজন্মেই কিনা জানিনা মনে হল বেশ কিছুটা দূরে কিছু যেন ঘটেছে। কিছু বুঝতে বা দেখতে পেলাম না। আমি আরও সজাগ হলাম ও গাড়ির স্পীডটাকে আরও কমালাম। হটাৎ আমার সামনে থেকে ঘন কুয়াশার পর্দাটাকে কে যেন সরিয়ে নিল। বৃষ্টিটাও যেন মনে হল অনেকটা ধরে গেছে। আমি আবার সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পারছি। যেন সুন্দর পরিষ্কার একটা দিন, যেন কিছুই হয় নি। মনে হল প্রকৃতি আমার সঙ্গে এতক্ষণ রসিকতা করছিল। আর একটু এগোনোর পরেই ঘটনাটা দেখলাম। যার কথা জন্মজন্মান্তরেও ভুলতে পারব না।

একটা নীল রঙের ছোট গাড়ি রাস্তা থেকে গড়িয়ে গেছে, পাশের খাদে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। একটা সবুজ রঙের মাঝারী সাইজের গাড়ি রাস্তার ধারে পার্ক করা। আরও দেখলাম রাস্তায় গাড়ি স্কিড করলে যে রকম দাগ হয় ওই রকম একটা কড়া দাগ। দাগটা সোজা নেমে গিয়েছে যেখানে গাড়িটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে সেই অবধি। ধারের রেলিংটা অর্ধেকটা ভাঙা। দূর থেকে বুঝতে পারলাম না গাড়িটার মধ্যে ড্রাইভার আছে না নেই। একটু এগিয়ে গাড়িটা পার্ক করলাম। গাড়ির থেকে নেমে আসার পর দেখলাম একটা লোক প্রাণপণ চেষ্টা করছে গাড়ির ভেতর থেকে ড্রাইভারকে বার করার। চোখ চলে গেল ড্রাইভারের দিকে। চমকে উঠলাম স্টিভকে দেখে। গোঙাচ্ছে, কাৎরাচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। যে লোকটা স্টিভকে সাহায্য করছিল এতক্ষণে তার দিকে চোখ গেল। চিনতে পারলাম, আমাদের অফিসেই কাজ করে, নাম গ্রেগ। আমায় বলল, প্রায় পনের মিনিট ধরে চেষ্টা করছে স্টিভকে বার করার, কিন্তু পারছে না। আমায় বলল, পুলিশকে ও এম্বুলেন্সকে কল করে দিতে। আমার সেল ফোন থেকে কল করে দিলাম। দশ মিনিটেই পুলিশ ও এম্বুলেন্স এসে গেল। আমি দেখলাম আমার আর কিছু করার নেই, মিটিঙের দেরীও হয়ে যাচ্ছে। আমি গ্রেগের কাছে বিদায় নিয়ে অফিসে চলে গেলাম। স্টিভের ম্যানেজারকে খবরটা দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। ঘনঘন আমার কাছে ফোন আর লোক আসতে লাগল খবর নেওয়ার জন্য। খবর পেলাম যে দরজা কেটে স্টিভকে বের করতে হয়েছে। হেলিকপ্টারে স্টিভকে কাছের বড় শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বেলা চারটার সময় খবর এল অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও স্টিভকে

বাঁচানো যায় নি।

প্রায় দুদিন পরে স্টিভের ফিউনারালের খবর পেলাম অফিসের ই-মেলে। অফিসের অনেকেই গেল ফিউনারালে, আমিও গেলাম। সকাল দশটায় চার্চ হাজির হবার কথা। গাড়ি পার্ক করে চার্চে ঢোকান মুখে দেখা গ্রেগের সঙ্গে। সেই গ্রেগ, যাকে দেখেছিলাম অ্যাক্সিডেন্টের ঠিক পরেই, স্টিভকে যে গাড়ির ভিতর থেকে বের করার চেষ্টা করছিল। গ্রেগ বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। আমায় দেখে দাঁড়াতে বলল। একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, “তোমাকে একটা কথা বলার ছিল, কাউকে বলবে না কথা দাও, তো বলব।” আমি একটু অবাক হলাম, সাধারণত আমেরিকানরা এ রকম ভাবে কথা বলে না। ওকে আশ্বাস দিলাম যে বলব না।

গ্রেগ বলতে শুরু করল, “অ্যাক্সিডেন্টটা যদিও আমি দেখিনি, কিন্তু মনে হয় পৌঁছেছিলাম মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। গাড়ি পার্ক করে যখন স্টিভের কাছে এলাম তখনও স্টিভের জ্ঞান ছিল, কথা বলছিল। আমায় বলেছিল ঘটনাটা।” একটু থেমে সিগারেটে টান দিয়ে গ্রেগ বলল, “স্টিভ নিজের মনে গাড়ি চালাচ্ছিল, হটাৎ দেখল সামনে বড়সড় একটা হরিণ দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তা জুড়ে। হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখল হরিণটার কোমরের কাছে একটা তীর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে, অথচ হরিণটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে না। রক্তও পড়ছে না, হরিণটা শুধু তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কি বিভৎস সে তাকানো! স্টিভের শরীরে যত রক্ত ছিল মনে হল যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঠিক এরপরেই বিরাট জোরে একটা পাশবিক চীৎকার শুনতে পেল। আওয়াজটা এতই জোরে যে মনে হল কানের পর্দাটাই বুঝি ফেটে যাবে। স্টিভকে স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়ে দুটো হাত কানে রাখতে হল। ওর মাথাটা ঘুরতে লাগল বনবন করে। আওয়াজটা বন্ধ হচ্ছে না। হটাৎ আওয়াজটা যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি বন্ধ হয়ে গেল। আবার একটা বিরাট জোরে আওয়াজ। যেন ভারী কিছু একটা কোথায় পড়ল। ভয়ে ভয়ে স্টিভ যখন চোখ খুলল দেখল যে তার গাড়িটা খাদের মধ্যে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। প্রথমেই ওর চোখ চলে গেল রাস্তার ওপর, দেখল হরিণটা নেই। অবাক লাগল, একটা তীরবিদ্ধ হরিণ কোথায় যেতে পারে? গাড়ির ভেতর থেকে বেরোবার চেষ্টা করল, পারল না। মনে হল, কোমরের নীচের দিকটা অবশ্য হয়ে গেছে। পা দুটো বশে নেই। কি হল, কি করে হল কিছুই বুঝতে পারল না। কথাগুলো বলতে বলতেই স্টিভ ক্রমশ তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এইসময়ে তুমি ঘটনাস্থলে এসেছ, এরপরের সব ঘটনাই তুমি জানো।” সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফেলে দেওয়ার আগে গ্রেগ বলল, “স্টিভের গাড়িটা খাদে পড়ার আগেই একটা রেলিংও ধাক্কা মারে, রেলিংটা ভেঙ্গে যায়। সেই ভাঙা রেলিংটা সোজা ড্রাইভারের দরজা দিয়ে গাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়। রেলিংটা ঢুকে স্টিভের কোমরটাকেও এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। স্টিভের যে নীচের দিকটা অবশ্য হয়ে গিয়েছিল সেটা এই কারণেই। পুলিশ ও এম্বুলেন্সের লোকেরা যখন দরজা কেটে স্টিভকে বার করে তখনই এসব কথা জানা যায়।”

গ্রেগের কথা শেষ হওয়ার পর আমরা চার্চের ভেতর ঢুকলাম। দেখলাম ওর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সবাই ওর সম্মুখে ভাল ভাল সব কথা বলছে। সামনের সারিতে ওর বউ নর্মা বসে আছে, খুব কাঁদছে। খুব এডভান্স প্রেগ্ন্যান্সি নর্মা, যে কোন দিন বাচ্চা হবে। স্টিভের ছোট ছেলেটা তার মার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে, কি করবে বুঝতে পারছে না।

হটাৎ স্টিভের সেই হরিণ শিকারের কথাটা মনে পড়ে গেল। মনটা চলে গেল সেই জঙ্গলে। মনে পড়ে গেল সেই হরিণটির কথা, সেই বাচ্চা হরিণটার কথা। কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম সমস্ত ঘটনাটার মধ্যে। কত

কথা মনে হচ্ছিল। সেই হরিণটা কি সত্যি এসেছিল, না কি ওটা স্টিভের মনের ভুল। আর নিতে পারলাম না। কাউকে কিছু না বলে আস্তে আস্তে ওখান থেকে উঠে পড়লাম। ৭

মাষ্টার মশাই মনোজিৎ ঘোষাল

“মাষ্টার মশাই যেন কষাই, বিদ্যা-শূন্য রঙারে, মেরে মেরে করে দিলে শরীরটাকে লম্বা রে!” এ ছড়া আমাদের মুখে মুখে ঘুরত রোজ। প্রফুল্ল বাবু আমাদের ক্লাস টিচার ছিলেন, প্রথম ক্লাসটা তাঁরই হ’ত। অবিনাশকে তিনি ক্লাস মনিটর করেছিলেন - সবচেয়ে বদমাইস ছেলে। যেখানে মারপিট সেখানে নিশ্চয় অবিনাশের দর্শন পাওয়া যাবে। তার কাজ ছিল যে সব ছেলেরা প্রফুল্ল বাবু ক্লাসে ঢোকবার আগে গোলমাল বা দুষ্টুমি করত তাদের দেওয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। কি দোঁদগু প্রতাপ তার! প্রফুল্ল বাবু এসেই সবাইকে নির্ভেদে দুই হাত দুই কানের ওপর রেখে মাটির ওপর ২/৪ ফুট ওপরে তুলে দুম করে নামিয়ে দিতেন। সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না - তবে তার চেয়েও খারাপ অভিজ্ঞতা ছিল জহুর বাবুর কাছে।

জহুর বাবু ইংরাজী ব্যাকরণ পড়াতেন। ক্লাসে ঢুকেই ছেলেদের আঙুল দেখিয়ে ডেকে তুলে প্রশ্ন করতেন। ঠিক মত উত্তর দিতে পারলে আর বিপদ ছিল না - না পারলে যে জোরে পাছায় বেত পড়ত তার ব্যাথা দু তিন দিন থাকত। পড়া সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে ৩/৪ জন বন্ধু মিলে ক্লাস পালিয়ে গেছি - সকলের পয়সা জড় করে কফি হাউসে এক কাপ করে কফি খাওয়া হত এক ঘন্টা ধরে। কফি হাউস তখন সবে খুলেছিল - ভিড় ফেটে পড়ত। সবাই এক কাপ কফি এক ঘন্টা ধরে খাবার খেদের। কখন কখন চার কাপ কফি পাঁচজন ভাগ করে খেয়েছি।

ক্লাস পালাবার খবর কেউ রাখত না, না রাখত বেত মারার খবর। ছেলেরা শারীরিক শাস্তি পেত মাষ্টারমশায়ের খেয়াল মত। এককাল পরে খুব অবাক হলুম ‘দেশ’ পত্রিকাতে এই গল্পটা পড়ে - এক শিক্ষিকা তাঁর আট বছরের ছাত্রীর কাঁধে দুটি ইঁট চাপিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন ২/৪ ঘন্টা। ১০০ ডিগ্রীর ওপর তাপমাত্রা ছিল, মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পরে মারা যায়। এমন দুঃখের কাহিনী ঘটেছে আমাদের দেশে ২০০৯ সালে।

শুধু চড় চাপড়ের কথা বললে অবিচার করা হবে। অনেকে ভারী ভাল পড়াতেন। অনাদি বাবু ক্লাসে ঢুকে যখন কথা ও কাহিনীর কবিতা পড়াতেন, আমরা সবাই তখন মুগ্ধ হয়ে শুনতুম। ‘অতিশয় অসময় অভাজন পরে, অযাচিত অনুগ্রহ’ - সেই গলার স্বর এখনও কানে বাজে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও নগরীর নটী জীবন্ত হয়ে উঠত অনাদি বাবুর ক্লাসে। ‘পিতৃ ঘাতকের সাথে খেলা,... এমন যে কাপুরুষ জয়

হবে তার’। গায়ে শিহরন তুলে দিতেন তাঁর ব্যাখ্যাতো।

শেষ করব এক অসাধারণ মাষ্টারের কথা বলে - ছাত্ররা সবাই তাঁকে ‘তোজা মাষ্টার’ বলে উল্লেখ করত তাঁর আড়ালে। ডাকলেন আমাকে মনো তোজা জিৎ, বললেন, তোমার রচনাটা খুব ভাল হয়েছে। এইরকম নতুন তোজা চিন্তা ধারাকেই বলে বিশেষত্ব। তোমরা সবাই এই লেখাটা মনো তোজা জিতের কাছ থেকে নিয়ে পড়বে।

তাঁর ভাষার দখল ইংরাজীতেও কিছু কম ছিল না। যখন ইংরাজী বলতেন তখন ‘তোজা’ বদলে হয়ে যেত ‘টু দি’। আমি হয়ে যেতুম ‘Mono to the Jit’। আমি তাঁর পেয়ারের ছাত্র ছিলাম। তা বলে সকলের সঙ্গে এমন ভাল ব্যাবহার করতেন না। মুখে লেগেই থাকত ‘তোজা বেতোতে হয়’। নইলে এমন ছেলে সোজা হবে না। বিশেষ অপ্রিয় ছিল নন্দ তোজা দুলাল, ওরফে Nanda to the Dulal. নন্দ তোজা দুলাল, তোজা বেতোতে হয় তোমাকে। প্রথম প্রথম আমরা হাসি চাপতে পারতুম না তোজা মাষ্টারের বাক্য বিন্যাস শুনে। তারপর দু একজনের পিঠে সত্যিই যখন বেত পড়ল, তখন হাসি থেমে গেল।

এ সব ১৯৪০ এর দশকের কথা বলছি। তখন বেতোলে কেউ ভ্রক্ষেপ করত না, বাপ মায়েরা নালিশ করত না। Assistant Head Master নিজে প্রতি শনিবার বেত নিয়ে বেরোতেন। প্রতি ক্লাসে ঢুকে ঢুকে লিষ্ট দেখে ছেলেদের ডেকে তাদের বেতোতেন। বিশেষ করে নন্দ তোজা দুলালকে। আর তোজা মাষ্টার রোজই বেতোতেন নন্দ তোজা দুলালকে। যেদিন বেশী রাগ হত সেদিন নন্দ তোজা দুলাল আর বলতেন না - বলতেন, নন্দ টু দি দুলাল। বলতেন, ‘Nanda to the Dulal - I will peel off your back skin, like peeling an orange’। নন্দ দুলাল খুব একটা আশঙ্কিত হত না। তার এসব অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। একদিন ডাকলেন, Nanda to the Dulal। সে পেছনের সারিতে বসে ছিল, দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমি নন্দ তোজা দুলাল এখানে’। তোজা মাষ্টারও হেসে ফেললেন। ৭

গঙ্গারামের বৌ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

গঙ্গারাম হরিরামপুর থেকে বিয়ে করে ভ্যান্ রিক্সায় করে ফিরছিল। হরিরামপুর থেকে নয়গঞ্জ তিন মাইল। নয়গঞ্জ থেকে বাস্ ধরলে বিষ্ণুপুর দেড় ঘন্টার পথ। তারপর মাইল দুই হাঁটা। তবে আসবে পটলডাঙ্গা। গঙ্গারামের বাড়ি। ভ্যান্ রিক্সায় গঙ্গারাম আর তার বৌ কালীতারা ছাড়াও লোক আছে। গঙ্গারামের ভাই হরিরাম আর বিষ্ণু•রাম, জ্যাঠা নীলকণ্ঠ, কাকা মিহিকণ্ঠ, জেঠুতো দাদা সীতারাম, পিসেমশাই দশরথ। একটা ভ্যান্ রিক্সায় যে কত লোক ধরে তার হিসেব নেই। সবাই পা বুলিয়ে বারমুখো হয়ে বসে আছে। শুধু চাকার কাছে যারা তারা হাঁটু মুড়ে, মাঝখানে একরত্তি জায়গায় কালীতারার নিশ্চয়ই খুবই আঁট হচ্ছে। রোগা চেহারা বলেই রক্ষা। ঘোমটায় ঢাকা, ফলে মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। বৌয়ের দিকে তাকাচ্ছেও না গঙ্গারাম। তাকাতে নেই, লজ্জার ব্যাপার আছে।

এখন যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে বৌ পছন্দ হয়েছে কিনা, তবে গঙ্গারাম বলতে পারবে না। বিয়ের সময়ও এমন রেখেটেকে রেখেছিল মুখখানা যে গঙ্গারাম অনেক চেষ্টা করেছে দেখতে পায়নি। এ বাড়িতে কোন মেয়ে কবে যেন শুভদৃষ্টির পরে সেই রাতেই বিধবা হয়েছিল। সেই থেকে কোন পন্ডিতে বিধান দিয়েছে, শুভদৃষ্টির সময় হাতপাখা দিয়ে মেয়ের মুখ ঢেকে রাখতে হবে। সুতরাং শুভদৃষ্টিও জলে গেছে। বাপ-জ্যাঠার কাছে শুনেছে দেখতে নাকি মন্দ নয়! ঐ শোনা কথার ওপরেই যা নির্ভর। এখন যদি গঞ্জে গিয়ে বৌ ভীড়ে হারিয়ে যায় তো গঙ্গারাম তাকে খুঁজে বের করতেও পারবে না।

গঙ্গারাম বসেছে ড্রাইভারের বাঁপাশে, পেছনে বৌ। ড্রাইভারের ডানধারে বুড়ো পিসেমশাই। দশরথের বৌ মরেছে দশ বছর। একটি মাত্র ছেলে সম্বল করে ছিল এতদিন। তা সেই ছেলে লায়েক হয়ে মদ-গাঁজা ধরে ফেলল। ঘরে আনল এক খান্ডারনী বৌ। সে-ই দশরথকে তাড়িয়েছে। লজ্জার মাথা খেয়ে দশরথ এখন এসে জুটেছে স্বশুরবাড়িতে। গঙ্গারামের বাপ-জ্যাঠা লোক ভাল, তায় ধর্মভীরু। তারা ভগ্নীপোতকে ফেলল না। বাড়িতে ঘরের অভাব নেই। ডালভাতেরও জোগাড় আছে। দশরথ এখন বাড়ির লোকই হয়ে গেছে। কাজেও লাগে। গঙ্গারামের জন্যে পাত্রী খুঁজে বার করেছিল এই পিসেই। তারই নাকি ভাগ্নী হয় সম্পর্কে। বয়স হলেও দশরথ হাতে পায়ে সচল, ক্ষেত খামার কাজ কারবার দেখাশোনা করে। সঙ্কটে পরামর্শ দেয়। দরকারে দশবার দোকান বাজারে যায়, পাওনা আদায় করে। এখন দশরথ না হলে তাদের বাড়িতে চলে না।

মাসটা মিঠে অগ্রহায়ণ। রোদের তেজ নেই তেমন। খোলা মাঠে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে ঠান্ডামত। ভ্যান্ওয়ালা সীটে বসে প্যাডেল করছে বটে, কিন্তু এতজনকে নিয়ে গাঁয়ের এবড়োখেবড়ো রাস্তায় শুধু প্যাডেলের জোরে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে গামা পালোয়ানের ক্ষমতাতেও কুলোবে না। তাই গঙ্গারামের স্বশুরবাড়ির দুই মুনিষ পেছন থেকে ঠেলা দিচ্ছে।

সারারাত দু চোখের পাতা এক করা যায় নি। জ্ঞাতিগুপ্তি তো এদের কম নয়। জনা পনের ছুঁড়ি সারারাত বাসর জাগিয়ে রেখেছে। গঙ্গারামকে কত না নাকানিচোবানি খাইয়েছে তার হিসেব নেই। তবে, তার রাগ হয়নি একটুও। বাসরে ওসব হয় বলে তার জনা ছিল। আর গঙ্গারামের রাগ বস্তাও বিশেষ নেই। কালীতারার তেরো বছরের বোন মহাবিদ্যা, দিদি রওনা হওয়ার সময় ছলোছলো চোখে বলেছিল, - ও জামাইদাদা, আমার দিদিকে ভালবাসবে তো? কথটা বুকে লেগে আছে খুব।

তা ভাল ও বেসেছে বৈকি! তবে কিনা এখনও চেনাজানাই হয়নি! মুখটাও দেখেনি মোটে।

পেছনে আর একখানা ভ্যান্ রিক্সায় দানসামগ্রী আসছে। তেমন কিছু নয়। একখানা নতুন সাইকেল, বাসনপত্র, লেপ তোষক, বৌয়ের দুখানা লোহার তোরঙ্গ। এ সবই বাসের মাথায় তুলে দেওয়া হবে।

টোপরটা এখনও গঙ্গারামের মাথায় বাসানো। ভারী অস্বস্তি। লোকে তাকায়। কিন্তু খুলতে গেলেই সবাই হৈ হৈ করে ওঠে। গুরুজনদের কথা না মেনেও উপায় নেই কিনা। ইতিমধ্যে দু দুবার উত্তুরে বাতাসে টোপর উড়েও গিয়েছিল। দুবারই কুড়িয়ে আনা হয়েছে। এখন গঙ্গারামকে হাত দিয়ে টোপর ধরে বসে থাকতে হচ্ছে।

গঙ্গারামের পেছনে, নতুন আত্মীয়স্বজনদের ঘেরাবেড়ার মধ্যে শাড়ির ভেতরে পুঁটুলি পাকানো তার বৌ। এটাই ভারী অবাধ লাগে গঙ্গারামের। পরশুদিন অবধি এ তার কেউ ছিল না। ছিল দুনিয়ার হাজারটা মেয়েছেলেদের একজন। আর আজ সে একেবারে তার নিজের বৌ! নিজের জিনিস! একে নিয়ে যা খুশি করতে পারে গঙ্গারাম। হ্যাঁ বটে, সে ভালবেসে ফেলেছে কালীতারাকে। কিন্তু কালীতারার মুখখানা ঢলঢলে না হতুকির মত শুকনো, ঠোঁট পুরু না পাতলা, দাঁত উঁচু না নিচু, চোখ পটলচেরা না কুতকুতে, সেসব কিছুই জানে না গঙ্গারাম। তবে হাতটা দেখেছিল কয়েকবার, হাতের তো আর ঘোমটা নেই। তাতে রংটা তেমন খারাপ লাগেনি। ফর্সা ঠিক নয় বটে, তবে ঐ ধার ঘেঁষেই। ঐ হাত আর শরীরের সীমানা দেখে বুঝেছিল, কালীতারা রোগাটে গড়নের। লম্বায় মাঝারি। এইটুকুই গঙ্গারামের এখন অবধি সম্বল।

না দেখেও যে ভালবাসা যায় এটা আজ খুব বুঝতে পারছে সে। কালীতারা গলার স্বরটা যে কেমন সেটাও কপালদোষে এখন অবধি জানে না। কথটা খুড়তুতো ভাই মদনকে বলায় সে ভারী মাতব্বরের মত বলেছিল, - র দেখিনি গঙ্গাদা। মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ আবার অন্যরকম হয় নাকি? সারাদিন যখন চিলের মত চিল্লাবে তখন তো কানে আঙ্গুল দিবি। ও দুদিন পরে শুনলেও চলবে।

ধুলোটে রাস্তায় পড়ে ভ্যান্ গাড়ি খুব ঝাঁকছে। কয়েকজন বুপঝাপ নেমে

পড়ল। নয়াগঞ্জ বেশি দূরেও নয়। ঐ দেখা যাচ্ছে বড় রাস্তার বাঁধ আর বাস-স্টপের কাছে দোকানপাটের ছড়াছড়ি। কথা আছে ওখানে নেমে সবাই চা-বিস্কুট খাবে। বেলা চারটেয় তাদের চেনা বাস ‘কেনারাম’ আসবে। তাতেই তাদের সীট রিজার্ভ করা আছে। ছাদে মালপত্রের তোলা হবে। তাদের লোকজন সব আগেভাগে গিয়ে থানা গেড়েছে নয়াগঞ্জে। বর-বৌয়ের জন্যে হরিপদর ট্যাক্সিটা ভাড়া নেওয়ার কথাও উঠেছিল - তাতে আরাম হত বটে, কিন্তু সকলের সঙ্গে এরকম যাওয়াটা তো হত না। বিষ্ণুপুরে ব্যান্ডপার্টি বসে আছে। বাস থেকে নামলেই ব্যান্ডপার্টি প্যাঁ-পোঁ-ঝিকির-ঝাঁই শুরু করবে। তারপর কাগজের ফুল দিয়ে সাজান ভ্যান্ রিক্সায় চেপে বাড়ি যাওয়া।

নয়াগঞ্জে ঢোকান আগেই ঝোপঝাড় পেয়ে ভ্যান্ থামিয়ে নেমে অনেকেই পেছাপ সেরে নিল। গঙ্গারামও। বৌটারও হয়ত পেয়েছে। কিন্তু বোচারার তো উপায় নেই, মুখ বুজে বসে থাকা ছাড়া। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোর যে কত অসুবিধে! বড় মায়া হচ্ছিল গঙ্গারামের। না, কালীতারার মেয়েজন্মের সব দুঃখ সে ঘুচিয়ে ছাড়বে।

কিন্তু মুন্সিল হল এখন অবধি কালীতারার মুখটা যে কেমন, তা-ই সে জানে না! হারিয়ে গেলে খুঁজেও পাবে না!

বাস রাস্তায় ভ্যান্ গাড়ি থামতেই গঙ্গারামের বোন পুঁটি আর পিউ ছুটে এল, সঙ্গে তাদের আরও দুই সই। তারা আগেভাগে এসে বসে আছে। লোকলস্করের অভাব নেই। মেয়েদের দেখে হাঁফ ছাড়ল গঙ্গারাম। বৌটা একটু সঙ্গ পাবে। মেয়েদের দরকার মেয়েরাই সব থেকে ভাল বোঝে।

বিয়ের পার্টি দেখে চারদিক থেকে লোকের চোখ এসে টর্চলাইটের মত তাদের ওপর পড়ছে। ভারী অসোয়াস্তি। সিঙ্গাড়া জিলিপির দোকান থেকে হাঁকাহাঁকি করছে। চীনেবাদামের ফেরিওয়ালা এসে মুখের দিকে তাকিয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে লেগেছে।

গঙ্গারাম কালীতারার দিকেই চেয়ে ছিল। পুঁটি আর পিউ নিয়ে গিয়ে বৌটাকে দোকানের সামনের একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে খুব কথা কইছে আর হাসছে। কালীতারা যেন কেমনধারা! এখনও এতটা ঘোমটা যে মুখখানা দেখার কোন উপায় নেই। ঐ মুখ একটবার দেখার জন্যে প্রাণটা ভারী আনন্দান্ করছে। কিন্তু কী কৌশলে, সেটাই ভেবে পাচ্ছে না সে। কিছু খাওয়াবে, ডাব বা জিলিপি বা সিঙ্গাড়া? খাওয়ার সময় হয়ত ঘোমটা সরাবে। কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব? তার ওপরে মেলা গুরুজন রয়েছে। খাওয়ার কথা বললে তো তারাই বলবে। বরদের বেশি আগ বাড়ানো উচিত নয়।

চা-বিস্কুট অবশ্য এসে গেল। বড় চায়ের দোকানটায় বোধহয় আগেই বলা ছিল। ছোট ছোট প্লাস্টিকের কাপে চা আর লেড়ে বিস্কুট। একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল গঙ্গারাম। কিন্তু ও হরি! কালীতারা মোটে চা-ই খেল না। বিস্কুটও ছুঁল না। অন্য মেয়েগুলো তো কেমন বেশ খাচ্ছে!

‘কেনারাম’ লেখা বাসটা এসে থামল ছড়মুড়িয়েই। গঙ্গারাম বিয়েতে পাওয়া হাতঘড়িটা দেখে নিল। চারটে দশ। ঠিক সময়েই বাস এসেছে আজ। অনেক লোক নেমে গেল এখানে। ছাদ থেকে মালপত্রের নামল মেলা। ভাইটাইরা ঝপাঝপ সাইকেল আর বাস্ক-প্যাঁটারা তুলে দিচ্ছে ওপরে। ভেতরে বেশ ভীড় আছে এখনও, জায়গা নেই। চেনা কন্ডাক্টর নরেন দাস ‘রিজার্ভ সিট ছেড়ে, রিজার্ভ সিট ছেড়ে’ বলতে বলতে বেশ কয়েকজনকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

বাস কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। এই নয়াগঞ্জেই ড্রাইভারবাবুরা চা-টা খায়, সিগারেট

টানে, একটু গ্যাঁজালি করে। ইঞ্জিনে জল ঢালা হয়। আজ আবার একই সঙ্গে উল্টোদিকে একটা বাস এসে দাঁড়াল। জায়গাটা ভীড়ে ভীড়াকার হয়ে গেল একেবারে। ভীড়ে লাল বেনারসীটা গঙ্গারামের চোখের আড়াল হয়ে গেল। টোপরটা খুলে মদনের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে গঙ্গারাম। এমনতেই সবাই ডাবডাব করে চাইছে, টোপর থাকলে তো আরও চিত্তির!

বিস্কুটটা মুখে রুচল না গঙ্গারামের। এমনতে সে লেড়ে খেতে ভালইবাসে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে আজ খ্যাঁটন হয়েছে জ্বর। ঘরে কাটা খাসীর দেদার মাংস, পুকুর থেকে তোলা বিশসেরী রুই, মোছব আর কাকে বলে? মাছের মাথা দিয়ে সোনামুগের ডাল ছিল, মাছের তেলের বড়া, বেগুণ ভাজা, মাছের কালিয়া, মাংস, পায়স - গঙ্গারামের দম্শম্ অবস্থা। জামাইদের একটু লজ্জা করেই খেতে হয়; কিন্তু শাশুড়ি ঠাকরুণ এমন ‘বাবা, বাছা’ করে খাওয়াল যে এখনও পেট আই চাই করছে। চা টুকু অবশ্য সে খেল। বেশ ঘন চা।

- একটা মিঠে পান খাবি, গঙ্গাদা? - মদন জিজ্ঞেস করল।

- তা খাওয়া যায়।

গঙ্গারামের নেশাটেশা নেই। চা-ও না খেলে চলে। বড়রা সবাই যে যার মত বিড়ি সিগারেট টানছে।

বাস ছাড়ল পৌনে পাঁচটায়। বেশ গ্যাঁট হয়ে বসেছে তারা। দাঁড়ান লোকও মেলা। গঙ্গারামের বাঁপাশে কালীতারা জানলার ধারটায় বসা। গায়ে গা লাগছে। বেশ একটা ভাল গন্ধ আসছে গা থেকে। সেন্ট টেন্ট হবে বোধহয়। বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছে গঙ্গারামের। বুকের ভেতরটা শিরশির করছে। কিন্তু মুন্সিল হল দাঁড়ান লোকগুলো ডাবডাব করে দেখছে ওদের। দেখার যে কী আছে? জগৎসংসারে কে না বিয়ে করছে বাপু?

কালীতারা মুখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে চেয়ে আছে। জানলার ধারের সীটের ঐ দোষ! বাইরে কিছু দেখার না থাকলেও লোকে চেয়ে থাকবেই। দেখার আছেটা কি? মাঠঘাট, গরুছাগল, গাছপালা, এই তো? ডানধারে যে জলজ্যান্ত একটা মানুষ বসে আছে তার দিকে নজরই নেই? হাতদুটো কোলের ওপর রেখেছে কালীতারা। মুঠোয় একটা ছোট্ট মেয়েলি রুমাল। গঙ্গারামের ভারী ইচ্ছে করছিল খপ্ করে হাতদুটো ধরে। কিন্তু এত লোকের সামনে কি আর তা পারা যায়?

ভারী উদ্বেগ গঙ্গারামের! এখনও মুখখানাই দেখা হল না। শুভদৃষ্টির সময় হাতপাখা দিয়ে মুখ যদি ঢেকেই রাখবে তো আর শুভদৃষ্টি করার দরকারটাই বা কি? যত সব কুসংস্কার!

ফুলতলিতে বাস থামতেই বেনো জলের মত লোকজন নামতে লাগল। ওপর থেকে ধূপধাপ মাল নামছে। দশরথ জানলা দিয়ে মুখ বার করে বলল, - ও মদন, ও চিতে, দেখিস বাপ্, মালগুলো চোখে চোখে রাখিস। কে কার মাল নামিয়ে নিয়ে যায়, হুঁশিয়ার থাকিস।

খুক্ করে একটু কাশল কি কালীতারা? আহা, গলাটা কি শুকিয়ে এসেছে? হতেই পারে। বৌটার দিকে কি কারও নজর আছে? সেই থেকে এক ঢোক জলও খেতে দেখিনি সে মেয়েটাকে।

তবে কালীতারা ঐ একবারই একটু খুক্ করেছিল। তারপর আর নয়। গরম লাগছে না তো? তা হবার কথা নয়। অগ্রহায়ণের শেষবেলা। গরমের বদলে বরং ঠান্ডা হাওয়াই দিচ্ছে। তবে কি টক্ করে ঠান্ডাই লেগে গেল? ভারী উদ্বেগ বোধ করতে লাগল গঙ্গারাম। শত হলেও ও তো তারই বৌ, আর

কারও বৌ তো নয় রে বাবা!

বাস্টা ফাঁকা। সবাই যে যার মত কথাবার্তা কইছে। কেউ বা ঢুলছে। মোটকথা, কেউ তাকাচ্ছে না আর তাদের দিকে। চারপাশটা একটু আড়চোখে দেখে নিয়ে কালীতারার হাত দুখানার দিকে খুব সন্তর্পণে হাতটা এগিয়ে দিতে গিয়েছিল গঙ্গারাম। কে যেন বলে উঠল, - না রে, কাজটা ভাল হচ্ছে না।

টপ করে হাতটা টেনে নিল সে। কথাটা বাইরে থেকে আসে নি, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। তার ভেতরেই একটি জ্যাঠামশাই বাস করে। কথাটা বলেছে সেই জ্যাঠামশাইটিই। কালীতারা হাতের ভাবগতিক টের পায়নি। সে যেমন ছিল তেমনই বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইল।

- ও দাদা! বৌদির সঙ্গে কথা কইছ না কেন? - পিউ পেছনের সীট থেকে ফুট কাটল।

গঙ্গারাম উদাস গলায় বলল, - কী বলব?

- আহা, সেটা কি আমি তোমাকে বলে দেব নাকি? বেচারি কখন থেকে চুপ করে বসে আছে! তুমি যেন কী!

গঙ্গারাম বোকার মত হেসে বলল, - বলবটা কী? মাথায় আসছে না যে!

- তাহলে উঠে এস এখানে, আমি গিয়ে ওর পাশে বসছি।

তাই হল। জায়গা বদল করে ভারী হতাশ হয়ে বসে রইল গঙ্গারাম। আজ কালরাত্রি। বাড়ি ঢোকবার পর আর বৌয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। সেই কাল রাত্তিরে দেখা হবে। ফুলশয্যায়! তার আগে আর নয়। তা এই চব্বিশ ঘণ্টা সময় যে বড় লম্বা মনে হচ্ছে! ঘন্টা না বছর তারই আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এটাই তো ভাল হল হে! - এ ফের সেই ভেতরকার জ্যাঠামশাইয়ের গলা, যার সঙ্গে গঙ্গারামের মতের মিল হয় না কক্ষণও।

গঙ্গারাম মনে মনেই বলল, - ভালটা কী দেখলে? অ্যাঁ! ভালটা কী হল?

- আহা, ঐ মুখ যতক্ষণ না দেখছ, ততক্ষণই মজাটা আছে। দেখলেই তো ফুরুর করে ফুরিয়ে যাবে! একদিন ও মুখের দিকে আর ফিরেও তাকাবে না বাপু!

- আহা, সে কবে কি হবে তাই ভেবে এখন থেকে বুড়োটোপনা করতে হবে নাকি?

- আরে বাপু, চব্বিশ ঘণ্টা পরে কালীতারার সবটুকুই তো পাবে তুমি। অমন হ্যাংলার মত কর কেন?

- দূর! দূর! বিয়ের ওপরই আমার রাগ হয়ে যাচ্ছে। শুভদৃষ্টির সময়ে কী কাণ্ডটাই হল বল দেখি? ও আবার কোন দিশি নিয়ম? পাখা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা!

- তাতে কি? চিরকাল তো আর মুখ ঢেকে রাখবে না। কিছুই ঢাকা থাকবে না। উতলা হও কেন? বরঞ্চ, এই যে দেখতে পাচ্ছ না, প্রাণটা আন্চান্ করছে, বুক টনটন, ভালবাসা ডাকাডাকি করছে ভেতরে, আবেগ উথলে উঠছে, এ কি আর এ জীবনে দ্বিতীয়বার হবে?

- তা অবিশ্যি ঠিক!

- তাহলে? আমি বলি কি, এই উচাটন সময়টাই বড্ড ভাল। এই সময়টুকু উপভোগ কর!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গঙ্গারাম। তারপর চোখ বুজে সময়টাকে উপভোগ করার চেষ্টা করতে লাগল। ❀

GHOST TRAP



Roshni (Rosie) Chowdhury

Age: 4

Once upon a time there was a million ghosts. Then there was strangers hunting for those ghosts. One was named Alex, that was the NUMBER ONE leader. There were 12 leaders. Alex was bigger than a pony.

Then there were three worried people who did not want to drive with the ghosts behind their cars. Everyone tried to drive fast but the ghosts were still following the cars. Then the strangers put ice-cream over the ghosts and then they poured water over the ghosts. Then the strangers put stingers on the ghosts. The ghosts were trying to RUN AWAY (the narrator here is waving her arms frantically) ...and take a bath. But the ice cream was all over them. They couldn't take it off... ha ha ha (much laughter here).

So the strangers were happy and they got Medals and Trophies from the people. They took good care of their medals and trophies and THEY WERE NUMBER ONE COPS (with much emphasis). THAT's ALL! ❀

The Mystery of 'Himba Digamma'

Tapan Das
Hyderabad, India

I guess there is nothing more intriguing, nothing more awe-inspiring or powerful than 'simplicity.' Do challenges seem bigger when we collect innumerable paraphernalia around it? We have perhaps grown into the habit of making simple things get lost in the crowd of complex associations around it. Yet, in spite of the habit, we are quite overwhelmed by the power of unadulterated simplicity, when such an instance presents itself. It all started with a Pujosankhya. Here I was, a well informed tourist, on my trip to Africa, taking in the wonders of the mines, the safari and the tribal handicrafts and nodding knowingly at things that I have already been expecting through a pre-tour Googling on Africa and suddenly my composure got a wee bit of jolt with one of Ibano's comments on digamma. Well, I actually heard 'Dugga ma' in the first instance and immediately gave him my full attention. 'What was it again?' 'Digamma, sir. Digamma.' He said, as I concentrated on his pronunciation and figured out, despite the perennial soft slur that's always present in his speech, that it was 'i' not 'u', a digamma, not a durga ma. Yet, my interest did not quite flag. We were on our way back from the Crown Gold Mines of Johannesburg in South Africa. It had been a tiring day indeed as we had descended to 742 feet down to the fifth lair of one of the richest Gold mines in South Africa. The giant wheel and the crude pulley which worked as a lift, had taken us down to the centre of the earth. Ibano, who acted as our interpreter and guide throughout this journey, was all along with us. His sense of humour and knowledge about the local myths and legends were mesmerizing. His English was intelligible but loud as usual.

Ibano was as intrigued by stories of India that he has heard as I was with Africa. He happened to catch a glimpse of a Pujo Sankhya which carried the photographs of goddess Durga killing Mahishasura 'Hey Mr Das, this looks exactly like our Digamma.' Before I could quite register what exactly he was talking about, he wanted to know where the Buffalo queen was. 'I can only see her head' he said, almost to himself as he took a good look at the picture. I looked stunned for a while, but I could make out that he was trying to bring to my notice a similar figure which he might have seen somewhere. I sat up straight on my seat and asked "you mean you have seen this image in South Africa". Yes sir, this is Digamma worshipped by the women tribal Doctors of the Himba community of our country. It was believed that only this particular tribe survived when the deadly plague killed the inhabitants of that region including the King and his whole family. The Kingdom and the

remains of this royal and magnificent edifice can still be seen which is called the 'Lost City' at the Sun City'.

Finding me a rapt listener, he continued. 'You should meet one of these doctors. They cure anything and everything by touching your body and praying to Digamma.' Now, my well practiced urban skepticism regarding mumbo-jumbo popped up immediately, over riding my curiosity of the Digamma for a second and I smiled to myself. 'There you go,' I thought and remembered all the instances of spooky village doctors in India, with their regular victims. The smirk must have shown on my face. Ibano insisted. "They charge 50 rands sir, and I am sure you will not regret the visit. We call them Himba Digamma doctors."

I was of good health except for level of cholesterol which was above normal. 'Let me try what these doctors have to say about me.'" Can you take me there tomorrow?' I enquired. 'Yes', was the quick reply from Ibano. We had a programme for local site seeing and we both decided to skip that programme so that we could see the mysterious Digamma. "I will wait for you at 8 O clock sharp. I will bring my bike sir. Just pay for the fuel." "Suits me fine, Ibano."

The whole night I could not sleep intrigued by this thought as Digamma and our goddess Durga Maa sounded so similar. The figures according to Ibano also looked familiar. But how on earth a particular tribe in Africa could worship Durga! My curiosity fuelled my imagination and I began speculating. Is there a cultural link between us? Are we the descendents of the same traditions? All these thoughts were creeping in my mind throughout the night.

Next morning Ibano was there in his colourful attire with a French cap on his head. "It is an hour's journey from here, sir and I have already sent a message that our Indian friend will be there for treatment." We covered a number of villages and reached a hilly terrain. We left the motorcycle at one of the shops and walked for a furlong till we reached Mumba's Clinic. Mumba was a fat Himba lady in a typical dress who welcomed us with flowers. I was told that the eldest female members of the family in this tribe have to take up this tradition. We were taken to a room and offered drinks. Ibano asked in their language about Digamma and wanted Mumba to show us Digamma. Mumba asked us to wash our hands and feet and took us to a nearby room. When the room was opened what I saw was just unbelievable. It was a standing wild buffalo with the face of a beautiful lady, with ten arms standing on a lion, which is one of the 'big five' animals considered iconic in Africa. She had a spear in her hands, piercing a female figure with a buffalo head lying at her feet. Each of the arms had some wild herbs and stems of different colors. White garlands in different shapes which resembled bulbs of garlic were on the necks of both the idols. What a contrast! Sometimes facts are indeed stranger than fiction. They call her Digamma and these women healers heal the common people by praying in front of Digamma and they are cured with the use of roots and dried stems. The whole room seemed eerie because of the awe for the unknown, the mysterious yet overwhelming

power that it had.

Ibano forced me to sit on a wooden platform. The healer felt my eyes, pulse and nails and asked me to taste a small herb and tell her the taste. Initially I could not make out what it was. Subsequently, I figured out that the root was salty to taste. She sat in front of the Goddess and chanted some incantation for about a couple of minutes. Finally, she stood up with smile and said 'My friend your health is in good condition except for 'coles-terol fat'. (cholesterol) which is on the high side. "Just swallow two white garlic pods with honey every morning and walk a mile or dance. Digamma will bless you always". I couldn't help but remember the numerous pathological and bio-chemical tests I had gone through previously in order for my doctor to come to the same conclusion. I felt almost embarrassed for being the technology dependent urbanite that I am! I somehow remembered one of Sukumar Ray's poem where a babu [urbanite] boasts of his load of bookish knowledge to a boatman and remarks that half the boatman's life is wasted if he didn't know answers to big issues of the world. A little later they were hit by a storm and the boatman asked the babu if he could swim and save his own life. For all

his theoretical knowledge, he did not have knowledge of this basic life saving skill. The boatman asked, 'santar jano na? tomar jibon to dekhi sholo aanaa i britha!' Quite an answer for the babu's pretentious know-all self satisfied attitude! I felt quite like the babu for a moment! A clove of garlic could do the trick, is it? And my doctor and I had made a big issue of it.

Most of the medicines I saw there were garlic of different shapes with some other herbs which I could not identify. Going through Google on my return, I realized how powerful Garlic was as a remedy. Though it was difficult to trace the origin but according to Sushruta, garlic can subdue all diseases. European medical thought eulogizes garlic as the rustic 'Heal All'. The Chinese hold it equivalent to Penicillin. The Greek, Roman and Egyptians swear by this wonder remedy. Well, simple, isn't it? Simple things do not quite strike us, do they? 'Sohoj howa kothin bodo i, taai to sohoj hoyo!' 🌱

How the Mermaid saved Mermaidville

Srija Sengupta

Age: 8

Once upon a time there was a mermaid. Her name was Maria. She had black hair. She was cute, beautiful and kind. She liked to read. She lived in Mermaidville. Maria had just been known to have a sweet voice. A wizard named Zack was evil. He was ugly. He wanted to destroy Mermaidville. So he got a disguise. No one would notice him. Zack wasn't smart. Maria was smart. Zack went to the sea. He put on the costume. He wove a spell. He dove in. Maria decided to take Zack on a tour. She thought he was normal. She greeted him like this, "Hi. My name is Maria. Welcome to Mermaidville. I am a tour guide. Tours cost free this year." Zack said, "Ok, I will go." So Maria showed Zack around town. Finally they came to the last part of the tour. Maria said "This is the last part of the tour. This is the rock to the city." Just then Zack got the rock. Zack was going to break the rock. Just then Maria knew who he was. "Guard!" cried Maria. The guards came and said, "What's all the hubbub?" "This is Zack." said Maria. Suddenly Zack couldn't breathe. His spell was over. Maria carried him to the surface. Zack could breathe again. Zack was touched by kindness. So he went away, never to be seen again. 🌱

My Trip to Nepal

Suryabrata Dutta



Every year or two, my family takes a trip to India to visit my grandmom. We decided to go this summer. But my parents surprised me when we got there. All of us, including my family in India, were planning to go to Nepal! I was really excited because we would get to see the Himalayas and other cool stuff. On the 4th of June, we landed at Tribhubon International Airport in Kathmandu, the capital of Nepal. Our travel guide picked us up at the airport and drove us to the hotel. Along the way, I got to see a glimpse of Kathmandu. It was a modern city, but not like New York or Atlanta. It was more like the suburbs of Calcutta. The climate was hot though I thought Nepal would be cold because of the altitude. In the distance, I could see a lot of mountains. After we got to the hotel, we went to Guhesowri Temple, which was dedicated to the goddess Durga. We saw a lot of monkeys inside and outside the temple. The next day, we visited world's famous Hindu Temple called Pashupatinath temple of Lord Shiva. This temple surrounds by many small temple, almost like a small palace. All of them were shaped like richly-ornamented pagoda houses. It was a really great experience to see one of the most Holiest Hindu temples. The following day was probably my most favorite day in the entire trip. We woke up at about 6 am and headed for the airport again. We decided to take the local mountain flight to see the entire Himalayan mountain range near Everest peak. As we climbed up into the clouds, the smallest mountains went by. At first, we saw a few mountains poking up into the clouds. Then, the mountains got bigger and bigger. Some of them, like Mount Everest & Mount Makalu, were so big that you'd think that their base were on top of the clouds. It was an incredible sight, and you'd only get to see that a few times in your life. The next day, we went to Bhaktapur, which held Nepal's Malla dynasty's biggest achievements in arts and crafts. There was an art gallery, and a Kali temple surrounded by many other temples. Bhaktapur was famous also for being the origin of Thangka Painting. This was a type of painting that symbolized Buddhist cultures, and included the Circle of Life, Dalai Lama's Mandala, and The essence of Nirvana. Then, we took a long ride to a place called Sunset point, where you could see 2 Mountain Ranges: The Himalayas and The Annapurna. It was called Sunset Point because the view at Sunset was

really spectacular. On our way back to the hotel, we stopped to visit a casino. Now as this was Nepal, there obviously was no age limit in the casino, so I got to play slots and see games like Blackjack and Roulette up close (My parents didn't let me play those). It was really fun. The next day, we wanted to visit another temple called Naranthon, but it was blocked because there was an accident involving 2 motorcycles and the police were investigating. So we went to a Buddhist temple called Shayambhu. At the top was a great view of Kathmandu where you could see everything in the city. We went to another temple called Dokhin Kali Bari (dedicated to, of course, the goddess Kali) and then we went to the one of biggest market in Nepal called Kathmandu Mall. On the roof was a restaurant, so we had a little snack there. That was actually the final day we spent in Kathmandu. The next day we went to Chitwan. It is famous for Chitwan National Forest (what else?). When we got there, we decided to go tour the city by a horse-rickshaw. Our horse's name was Sundari, meaning beautiful. The next day, we took an Elephant ride through the forest. We saw deers, snakes, birds, tigers, and rhinos. The rhino's were cool. I thought they had rough skin, but the skin actually looked very smooth. After that, we went to this huge temple called Manakamana. It was on top of a 1302 meter hill. There were two ways to get to it. You could walk to it (which would take an Olympic runner about 4 to 5 hours) or you could take a cable car. After we got to the top, we still had to walk for 10 minutes before reaching the main temple. The parts that were the most unsettling were the sacrifices. Hindus believed that the temple would bring them luck, so everyone took a chicken or a goat and sacrificed it. After we got back, we went to Pokhara. Along the way, we got to enjoy a lot of the scenery, especially the rivers and mountains. We passed the Bagmati, Narayani, Trisuli, and Sheti Rivers on the way there. I noticed that every single hill in Nepal (and there are a lot, believe me) had been terraced and farmed. It seemed Nepalese can use all the resources given to them. They are really very hardworking people. Pokhara was supposed to be right next to the Annapurna Range, but you could only see the mountain range at sunrise. So the next day, we woke up early to see the huge white ranges behind the green rolling hills. First we went to Mahendra Cave, which was this huge cave with sculptures of gods and goddesses. Next we went to David's fall, which was named for the person who found it, but accidentally fell and died. We visited the Seti River gorge. The Seti river is actually white because of the limestone sediments found there (limestone is what created the cave and the waterfall). And finally, we visited Lake Fewa. It was a huge lake miles across. We rented a boat and went out onto the lake for a while before everyone in my family (except me) got scared and returned to land. We then traveled to Raxaul, India. On our way there, some people blocked the road because they were angry at the president (Nepal just had their election) and wanted to send a message to the government. We had to wait on the open road in 110 degrees for more than 6 hours before they opened the road again. We reached Raxaul late in the night. The next day, we caught a train back to Calcutta with lots of good memories with me. What a trip! ♡



Apu Leaving Nishchindipur
Asit Sengupta

Thank you

The Bangamela 2009 Steering Committee would like to extend its heartfelt thanks to all the performers for their participation, and especially the people below for accepting our invitation to organize, participate, and perform in the Opening Day programs of the three-day Utsab.

NATIONAL ANTHEMS: USA, India and Bangladesh

Participants: Amitava Sen, Anurupa Kar, Arunava Saha, Ashoke Sarker, Debasree Dutta, Mahua Mukherjee, Ruma Sengupta, Sabari Roy, Saibal Sengupta, Srijita Mukherjee, Taslima Sultana Polly

Direction: Amitava Sen

Nritya Geeti Alekhyia - ASAMANYA NARI *Presented by Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA)*

Participants: Aditi Dey, Alo Dutta, Anurupa Kar, Indrani Munshi, Kalyani Kar, Mallika Halder, Pallavi Purkayastha, Paroma Chakravarty, Piyasa Molly Paul, Pritika Halder, Riya Purkayastha, Rumela Basu, Sabari Roy, Sanchari Roy, Sharon Roy, Shinjini Das, Shrinka Roy, Sima Banerjee, Sonia Nandi, Sujata Chakraborty, Urvashi Betarbet, Malvi Jani, Tanya Khasnavis

Script: Richa Sarkar

Choreography: Kalyani Kar, Sabari Roy

Music (Arrangement): Raktim Sen

Dance Drama - EKTA CHHOTTO BANGLA GARECHHI

Presented by Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA)

Participants: Aaditya Saha, Abhi Mukherjee, Amrita Sarker, Ananya Roy, Briti Nandi, Eleena Ghosh, Ilona Mukherjee, Isheetta Mukherjee, Kriti Nandi, Piyasa Molly Paul, Priasha Paul Shreya, Pritha Banik, Priyansha Das, Pushan Paul, Radhika Chattopadhyay, Rishi Dutta, Riya Purkayastha, Sharon Roy, Shinjini Das, Sneha Ghosh, Sohawm Sengupta, Sourav Sengupta, Srija Dutta, Suporna Chaudhuri, Suraaj Samanta, Swastika Mukherjee, Tinny Datta

Direction: Banhi Nandi & Raktim Sen

Choreography: Banhi Nandi

Music: Raktim Sen

BANGAMELA 2009 - A BRIEF REVIEW

Every year the month of July holds a special place in the hearts of the North American Bengali Diaspora. The first and third weekend witnesses the congregation of community members at two momentous cultural and social events - the North American Banga Sammelan and the Banga Mela. The former, in its scope and budget, is the grandiose of the two events and has, hence, confined itself to the mega cities of North America. The latter consciously tries to emulate and foster the more laid back and provincial charm inherent in the region where the event originated - the Mid-America States.

So it was with some trepidation that one may have approached the Banga Mela hosted by Atlanta - a big city on its own right. Would the event be missing its welcoming smile for each and every visitor - parlaying a sense of familiarity and comfort? The challenge was accepted by the Steering Committee Members, Nirajan Talukdar, Mamata Paul, Anil Chakrabarti, Achintya Dey, Soumen Ghosh, Kiriti/Shanta Gupta, Umashankar Mondal and Moitri Sarkar. The team of dedicated organizers had devoted more than a year's worth of intense planning, coordination, negotiation, compromise and execution to host the event. The intent was loud and clear - to maintain the essential legacy of the event and not succumb to the opportunities that a big city like Atlanta affords.

The event which kicked off on a Friday evening on July 17, 2009, paced itself well. The proceedings started with a Diya Ceremony of lighting of mangalic diya on the stage with Vedantic chanting and beating of ceremonial dhaks. This was followed by the singing of the national anthems of three countries - USA, Bangladesh and India. The next two events were local Atlanta productions. The first one portrayed the legend of women via dance and the second an intimate look at the distractions and satisfactions of imbuing to the Diaspora kids a sense and context of their legacy. This was ably presented via a song and dance theme centered on two popular weekend Bengali activities - dance and Bangla lessons. The evening concluded with the rock band legends - Bhoomi - who were felicitated on stage for their 10 years of touring together. For ones who preferred the quietness of a movie theater - there were, in parallel, the screenings of several Bengali films.

Saturday started early with a program entitled "Meet with a Dignitary" where the dignitary was no other than the famous Bengali writer Samaresh Majumdar. Successive presentations were from community organizations, from cities like Cary, NC, Louisville, KY, Birmingham, AL, Columbus, GA and the local Atlanta Groups. These events were interspersed with invited

artistes from Kolkata (Aloke Roychoudhury - variety) and Dhaka (Shama Rahman - songs of Rabindranath and Nazrul). Panther Panchali - the dance troupe presented their unique fusion of traditional and social themes mixed with compelling multi-media presentations. The evening concluded with Subhomita and Group and Pratik Choudhury and his Group. For Pratik, this was his first performance in the US. In parallel sessions, Bengali movies played while the Business Forum moderated by journalist Suman Chattopadhyay and Basu Dutt discussed business opportunities in Bangladesh and India for entrepreneurs with several major Business Groups from Bangladesh and India..

Sunday's featured artist was Jojo from Kolkata whose interaction and playfulness with the adoring audience once again underscored the intimate nature of the programs. Mr. Samares Majumdar headed the list of speakers in the literary forum, running in parallel, which brought together enthusiastic participants on lively discussions of the current state of literature and society. Pratik and Jojo's performance together evoked much appreciation. One by one all the invited artists joined Jojo and Pratik on stage as the proceedings wound down with a rendition of Purano Shei Diner Katha (Harking back to the old days). Bangamela 2009 concluded with an encore performance from Pather Panchali dance group with the eager participation of majority of the Steering Committee members on stage in the end.

Through all three days, guests had access to a selection of jewelry, clothing, music and video/CD vendors who had set up shop and a food vendor for a quick bite between programs. The Youth Committee ran an able ship with their range of organized activities to keep the young occupied while the parents found a quiet moment to enjoy the musical talents on display. The organizers earned Kudos from all participants for running a tight ship with everything on schedule and offering a wide variety of entertainment options - all in the spacious and pleasant environs of the Gwinnet Center of Performing Arts. ♣

BAGA 2008-2009 Financials					
2008 Beginning Balance			2009 Beginning Balance		
Checking	\$	12,407.69	Checking	\$	(2,050.00)
Savings	\$	27,070.31	Savings	\$	38,744.40
2008 Operations			2009 Operations as of September 21st		
	Income	Expenses		Income	Expenses
Administrative	\$ 420.00	\$ 1,456.00	Administrative	\$ -	\$ 394.00
Saraswati Puja	\$ 13,496.00	\$ 3,946.00	Saraswati Puja	\$ 11,686.00	\$ 2,095.00
Kobi Jayanti	\$ 6,488.00	\$ 5,549.00	Kobi Jayanti	\$ 3,320.00	\$ 2,806.00
Picnic	\$ 396.00	\$ 868.00	Picnic	\$ 715.00	\$ 595.00
Mahalaya	\$ -	\$ 513.00	Mahalaya	\$ -	\$ 1,152.00
Durga Puja	\$ 30,024.00	\$ 53,470.00	Durga Puja	\$ 3,399.00	\$ 4,018.00
Laxmi Puja	\$ -	\$ 1,749.00	Laxmi Puja	\$ -	\$ 852.00
Pratichi	\$ 17,405.00	\$ 4,488.00	Pratichi	\$ 5,081.00	\$ -
E-Bagazine			E-Bagazine	\$ 130.00	
Total	\$ 68,229.00	\$ 72,039.00	Total	\$ 24,331.00	\$ 11,912.00
2008 Checking			2009 Checking		
2008 Beginning Balance	\$	12,407.69	2009 Beginning Balance	\$	(2,050.00)
2008 Income from Operations	\$	(3,810.00)	2009 Income from Operations todate	\$	12,419.00
2008 Investments to CD	\$	10,000.00	2009 Investments to CD	\$	-
2008 End Checking Balance	\$	(1,402.31)	2009 End Checking Balance todate	\$	10,369.00
2008 Savings			2009 Savings		
Beginning Balance	\$	27,070.31	Beginning Balance	\$	38,744.40
Added Investments	\$	10,000.00	Added Investments	\$	-
Interest Income	\$	1,674.09	Interest Income	\$	-
2008 End Savings Balance	\$	38,744.40	2009 End Savings Balance as of Sep.	\$	38,744.40
Bangamela 2008-2009 Financials					
	Income	Expenses			
Administrative	\$ -	\$ 2,425.00			
Bangamela	\$ 89,537.00	\$ 72,158.00			
Ahwan Magazine	\$ 10,075.00	\$ 3,355.00			
Holi Fund Raising	\$ 2,643.00	\$ 1,308.00			
Total	\$ 102,255.00	\$ 79,246.00			
Net Income	\$ 23,009.00				

We sincerely acknowledge the following BAGA well-wishers for their generous support in terms of Donation or valued contribution for this year's Durga Puja.

Patron (5 Star category support):

Mira & Tushar Bagchi, Stone Mountain, GA
 Jayasri & Jayakumar Mallavarapu, Cumming, GA
 Mamata & Mridul Paul, Alpharetta, GA
 Sukla & Umasankar Mondal, Snellville, GA
 Dharmajyoti Bhowmik, Alpharetta, GA
 Ruma & Samar Mukhopadhyay, Atlanta, GA
 Shanta & Kiriti Gupta, Stone Mountain, GA
 Adity & Priyabrata Dutta, Alpharetta, GA
 Mala & Pradip Basu, Suwanee, GA
 Babita & Ansu Maitra, Suwanee, GA
 Saswati & Raja Banerjee, Norcross, GA
 Anupa & Abir GuhaThakurta, Marietta, GA

Joyita & Murali Hedge, Suwanee, GA
 Reshma & Poul Williams, West Fort, MA

Contributor (3 Star category support):

Ananda & Ria Rakhit, Duluth, GA
 Papiya & Chandan Dutta, Alpharetta, GA
 Kabita & Moni Roy, Atlanta, GA
 Joy Bhattacharjee, Atlanta, GA
 Parnika & Anil Chakrabarti, Lawrenceville, GA
 Srimita & Amiya Ray Chaudhuri, Suwanee, GA



"Creating Excellence in Dental Healthcare"

13 Offices in the Metro-Atlanta Area

Cascade Road Conyers Corporate Square (Atlanta)
Decatur Douglasville Eagles Landing (Stockbridge)
Fayetteville Kennesaw Lawrenceville Midtown
Newnan Roswell Snellville

770-242-3260

www.NanstonDental.com

Complete Dental Care for You and Your Family
General and Restorative Dentistry
Cosmetic Dentistry

Specialty Services Available Within Our Network
Most Insurances Accepted
Convenient Appointment Times
24-Hour Emergency Care Available

New Patient Offer

**Bring this advertisement to your first appointment and
receive a \$75 CREDIT toward any service in our office!**

*Cannot be combined with other promotions. Offer available to new patients only. Expires 5/31/2010.

**Recommended by Anil Chakrabarti
Satisfied Patient of Dr. James Carter at Nanston's Lawrenceville Office**

বেঙ্গল ষ্টোর এন্ড হালাল

!!! শুভ দূর্গা পূজা !!! শুভ দূর্গা পূজা !!!

বাংলাদেশ থেকে সরাসরি আমদানিকৃত
সর্ববৃহত বাংলাদেশী গ্রোসারী ষ্টোর !!!

পূজা সংখ্যার জন্য আজই আপনার নিকটস্থীয় বেঙ্গল ষ্টোর এন্ড হালাল মিট এ যোগাযোগ করুন !!!

FRESH HILSHA / RUHU / KATLA

Phone No. 770-986-4111; FAX:770-986-0107

WE CARRY ALL THE LATEST BANGLADESHI DRAMAS, BANGLADESHI & INDIAN
BANGLA FILMS AND HINDI FILMS

গোবিন্দভোগের চাল পাওয়া যায়

বাংলাদেশী পাইজাম চাল, নাজিরশাইল চাল পাওয়া যায়

CHAMBLEE BRANCH 2493 CHAMBLEE TUCKER RD SUITE # D (CORNER OF BUFORD HWY & CHAMBLEE TUCKER RD) CHAMBLEE, GA 30341	LILBURN BRANCH 950 INDIAN TRAIL RD SUITE # 3-A (CORNER OF INDIAN TRL RD & DICKENS RD) LILBURN, GA, 30047
---	---



**A galaxy of Indian Spices & the Freshest
Indian Vegetables in the town!**

**A wide collection of DVDs & VHS for
rental!!**

Exceptional Customer Service!!!

**INDIA PLAZA
2905 Jordan Ct Suite E
Alpharetta, GA 30004-3843
Phone: (678) 867- 0388**

Occasions

EVENT CENTER

passion . vision . dreams

**NOW
OPEN**



ATLANTA'S FIRST ALL EXCLUSIVE EVENT CENTER

*From the management that brought you
the previous famous
Maharaja Restaurant & Banquet Hall*

2101 Northlake Parkway • Tucker, GA 30084
(404) 503-5335 • (770) 723-3728
www.occasionsatlanta.com

Accommodation up to 300+ people.
Pre-Function area for cocktail and hor 'devours
Bridal suite & changing room for the
special dulhan
Extravagant Venue For All Occasions
Ample complimentary parking

Belly Dancing

Friday & Saturday:
Belly Dancing
8:00-10:30 p.m

Belly dancing is only
performed if there is not
a private event

Call for information and timings



From 25 to 2000 people

Cafe Bombay can accommodate you and your guests catering needs for any event. We specialize in weddings, birthdays, conventions, anniversaries, and other private events. We also work with Atlanta venues to offer you an unforgettable event.

For private events and catering services, please contact 404.320.0229

Lunch: Monday-Friday: 11:30am-3:30pm
Saturday & Sunday: 12:00pm-4:00pm

Dinner: Sunday-Thursday: 5:00pm-10:00pm
Friday & Saturday: 5:00-10:30 pm

Cafe Bombay

1622 Woodcliff Drive NE • Atlanta, GA 30329

Tel: (404) 320.0229 • Fax: (404) 320.0125

www.cafebombayatlanta.com • cafebombay@bellsouth.net



© 2009 Mehru Designs



FAMILY DENTISTRY

- Natural looking crowns & bridges
- Teeth whitening
- Braces for adults & children
- Dental implants to replace missing teeth
- Root canals
- Dentures & Partial
- Porcelain Veneers
- Oral Surgery & Extractions

Most traditional insurances accepted & filed for you

- Cigna
- Metlife
- Principal
- Aetna
- Ameritas
- Delta Dental

& many others...

**New
Patients
Welcome**

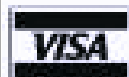


**Emergency
Patients
Welcome**

**ADVANCE
DENTAL CENTER**

770-751-8800

www.AdvanceDentalCenter.com



11130 State Bridge Rd • Ste C-204
Located across from Walgreens



GOKUL SWEETS

SPECIAL ATTRACTION

1. AFLATOON
2. MAVA BADAM
3. MAVA PUFF
4. DRYFRUIT HALWA
5. PISTA GHARI
6. CHANDRA KALA
7. METHI LADDU

OPEN SEVEN DAYS A WEEK
WE SHIP ANYWHERE IN USA

**PURE
VEG.
RESTAURANT**

**LONG HRS
TUE-SUN:
11AM-10PM
MON:11AM-9PM**

SPECIAL SWEETS

1. KAJU KATHLI
2. KAJU PISTA KATHLI
3. MAN PASAND
4. MOHINI ROLL
5. DIL KHUSH
6. KAJU ROLL
7. PISTA ROLL
8. ANJIR ROLL
9. HALWA SUN

ONLY STORE IN ATLANTA OFFERS:
SWEETS, NAMKIN, SNACKS, THALI, NORTH & SOUTH INDIAN DISHES,
GUJARATI DISHES, CHINESE DISHES,
CHAAT, FRESH FRUIT JUICES, FALOODA, KULFI,
AND LOT MORE

EVERYTHING UNDER ONE ROOF

CATERING FOR PARTIES & ALL OCCASIONS

SWEETS

1. PEDDA
2. KESARI PEDDA
3. BADAM BARFI
4. PISTA BARFI
5. MANGO BARFI
6. CHOCOLATE BARFI
7. COCONUT BARFI
8. FRUIT BARFI
9. MALAI BARFI
10. TRI COLOR BARFI
11. DUDHI HALWA
12. GAJAR HALWA
13. PINEAPPLE HALWA
14. CHIKOO HALWA
15. KALAKAND
16. BOURNVITA KALAKAND
17. AJMERI KALAKAND
18. MOTICHUR LADDU
19. BUNDI LADDU
20. CHURMA LADDU
21. BESAN LADDU
22. KHAJUR ROLL
23. ADADIYA
24. MAESOR PAK
25. BALU SHAI

SWEETS

26. BOMBAY KARACHI HALWA
27. BADAM HALWA
28. MONTHAR
29. SWEET BUNDI
30. JALEBI (YELLOW)
31. JALEBI (ORANGE)
32. GULAB JAMUN
33. KALA JAMUN
34. SWEET CUTLET
35. SANDESH
36. RASGULLA
37. REGULAR CHAM CHAM
38. PINK CHAM CHAM
39. YELLOW CHAM CHAM
40. MALAI CHAM CHAM
41. MALAI JAM
42. MALAI SANDWICH
43. CHANAR MURKI
44. RAS MALAI
45. RABDI
46. RAS MADHURI
47. DOODH PAPDI
48. PATISA
49. SOHN HALWA
- & MANY MORE

SPLENDA SWEETS

1. KALAKAND
2. MANGO BURFI
3. GAJAR HALWA

NAMKEEN

1. FLOWER GATHIA
2. BHAVNADRI GATHIA
3. MARI GATHIA
4. PAPDI
5. SPRINKLE PAPDI (SPICY)
6. CHORA PHARI
7. FINE SEV
8. BIKANERI SEV
9. THICK SEV
10. TIKHA GATHIA
11. REGULAR MIXTURE
12. HOT MIXTURE - BHUSU
13. POHA CHEVDA
14. KHATTA MITHA CHEVDA
15. CORN CHEVDA
16. CHAKRI
17. FARARI CHEVDA (SWEET)
18. FARARI CHEVDA (HOT)
19. SAKKAR PARA
20. NAMAK PARA
21. METHI PARA
22. SALTY CASHEW
23. SPICY CASHEW
24. BLACK PEPPER CASHEW
25. GREEN PEAS
26. REGULAR DALMOTH
27. NIZAM DALMOTH
28. MASALA PEANUTS
29. PEANUT BHUJIA
30. MASALA MOONG
31. MOONG DAL
32. CHANA DAL
33. BHAKARWADI
34. FULWADI
35. RAITA BUNDI
36. MASALA BUNDI
37. REG. BANANA CHIPS
38. HOT BANANA CHIPS
39. BLACK PEPPER BANANA CHIPS
40. SPICY POTATO CHIPS
41. BHEL (NAMRA CHEVDA)
42. NAN KHATAI
43. DRYFRUIT KACHORI
44. MORA SATHA (KHAJA)
45. FAFDA
46. PANI PURI
47. KHARI PURI

C-763 DEKALB IND. WAY, DECATUR, GA 30033 * 404-299-2062 / FAX: 404-299-7184



Best Wishes from

Poona[®]

Indian Restaurant

Dine in || Take Out
Catering || Banquet



www.PoonaRestaurant.com

3820 Pleasant Hill Rd
Duluth, GA 30096

t: 770-232-1234
f: 770-232-1293



*85N Bound - Take Pleasant Hill Rd Exit.
Left at the exit. Pass Buford Hwy, at the
4th light - Poona Restaurant on Right

*141N Bound - Right on State Bridge Rd.
After Passing Peachtree Ind Blvd, at the
2nd light - Poona Restaurant on Left.

Lunch Buffet:

Mon-Fri: 11:30 am - 2:30 pm
Sat-Sun: 12:00 pm - 3:00 pm

Dinner: a-la-carte:

Sun-Thur: 5:30pm - 10:00 pm
Fri & Sat: 5:30 pm - 10:30 pm

GANESH INDIAN MARKET



10504 Alpharetta Highway
Roswell, GA 30076
Phone: 770-649-7777
Fax: 770-649-7761

Groceries
Fresh Vegetables
Frozen Vegetables
Ready to Eat

Store Hours:
Mon: 12 a.m. - 9 p.m.
Tues-Sun: 10 a.m. - 9 p.m.

Phone Cards Available

KUMAR | PATHAK

A Limited Liability Company
Georgia | New Jersey

PARTNERS

Roy Banerjee • Poonam Bhuchar • Sonjui L. Kumar • Anshu Pathak • Kirtan Patel • Nikhil R. Prabhu • Neel Shah

ASSOCIATES

Michael Austin • M. Khurram Baig • Oscar Escobar • Angelina Kim • Samir Patel • Ritu Verma

OF COUNSEL

Gai Lynn McCarthy • Pratima Patel

Real Estate Law:

- Commercial Real Estate Closings
- Residential Real Estate Closings
 - Hotel & Motel Closings
 - Landlord-Tenant Matters
 - Real Estate Contracts
 - Leases

Civil Lawsuits, Trials, Hearings,
Arbitration, Mediation

Wills, Trusts & Estate Planning & Probate

Sports & Entertainment Law

Employment Law

Business & Corporate Law:

- Business Closings • Corporations
- Partnerships • LLCs • Contracts
- Franchise Law

Bankruptcy Law

Immigration Law:

- Non-Immigrant Visa
- Employment based Immigration
- Department of Labor Audits
- Consular Processing
- Citizenship
- Family based Immigration
- Deportation, Asylum & Refugee Applications



Front row from left: Angelina M. Kim; Sonjui L. Kumar; Ritu Verma

Back row from left: Kirtan Patel; Nikhil (Nick) R. Prabhu; Samir C. Patel; M. Khurram Baig; Roy Banerjee

1117 Perimeter Center West • Suite W311 • Atlanta, GA 30338
Tel: 678.443.2220 • Fax: 678.443.2230

51 Cragwood Road • Suite 102 • South Plainfield, NJ 07080
Tel: 908.769.7000 • Fax: 908.769.7774

www.kumarpathak.com

Hindi, Urdu, Punjabi, Gujarati, Marathi and Korean Spoken

We are pleased to announce that attorney Gai Lynn McCarthy has joined our firm as a **bankruptcy** attorney, and will be handling Chapter 7, 11 and 13 bankruptcy cases.





CHERIANS

INTERNATIONAL GROCERIES

**Now moved
to our new building
for better service!**
(behind old building)

**Fresh Vegetables,
Groceries, Appliances,
Luggage & Lot More**



BEST QUALITY, BEST PRICES, BEST SERVICES



Guaranteed Lowest Prices Everyday

**751 Dekalb Industrial Way,
Decatur, GA 30033
Tel: (404) 299-0842**

www.cherians.com



Best Wishes from "Market Pharmacy"

Get well at "Market Pharmacy"

*We take medicaid and medicare part D
Ask "Roger" or "Joy" for best price*

Phone: (404) 524-8888

Fax: (404) 524-9999



We deliver medicine free of cost

DR. RAJENDER SINGH, M.D.

OUR MISSION IS TO PROVIDE CARING AND PERSONALIZED, QUALITY SERVICE TO OUR PATIENTS.

Services Provided

Internal Medicine
Family Medicine
Minor Emergencies
Onsite X-ray/Lab
Allergy Shots

Routine Physicals
Hair/Acne Removal
Preventive Medicine
Travel Counseling
EKG/Lung Function

Routine Vaccinations
Cancer Screening
Weight Management
Skin Rejuvenation/
Tightening

All Insurances Accepted

WE ACCEPT WALK-INS • OPEN 7 DAYS A WEEK

Monday-Thursday: 8AM-6PM • Friday-Sunday: 8AM-2PM

Doctor can be reached 24/7 via phone

678-366-1200

**SOHUM
MEDICENTER**



INTERNAL MEDICINE • FAMILY PRACTICE

9995 Jones Bridge Road • Johns Creek, GA 30022

Located at the intersection of Old Alabama Road & Jones Bridge Road

WWW.SOHUMMEDICENTER.COM

Serving Individuals
and Groups of
Any Size.



ASSURANT Health



HUMANA
Guidance when you need it most

Paying Too Much For Your Life & Health Insurance? Maybe I Can Help!

I Don't Work for an Insurance Company, I work for YOU!

I represent a carefully selected insurance and investment companies and help you in making a decision on which company you should go with.

- Individual Health Insurance Comparisons
- Group Health Insurance Comparisons
- Term Life Insurance Comparisons
- Long Term Care Comparisons
- Disability
- Visitor's Health

We Can Also Help you with:

- IRAs
- 401k, SEPs, SIMPLE
- Mutual Funds/Annuities
- Financial planning/Tax Saving Strategies



Rajesh Jyotishi
CFP, CSA, CLTC

(770) 451-1932

www.ShalinFinancial.com

RJ@ShalinFinancial.com

Shalin Financial Services, Inc.
Experience Makes The Difference!

Securities offered thru FSC SECURITIES CORP. • A Registered Broker Dealer. Member of NASD/SIPC.

With Best Compliments from

SPALDING CORNERS TRAVEL

BEST FARES ALL AROUND THE WORLD!



WE ARE AT GLOBAL MALL

**5675 JIMMY CARTER BLVD, SUITE 554
NORCROSS GA 30071**

PH: 770-441-1164 FAX 770-448-1723

EMAIL: SPALDINGCORNERSTRAVEL@YAHOO.COM

Enhance Your Image
Digital Banners - Posters - Vehicle Graphics

PRINT & SIGNS

Printing	Menus
Graphics Designing	Web Designing
Booklets	Signs
News Letters	Vehicle Graphics
Neon & Electric Signs	Digital Printing
Banners	Trade Show Displays
Lamination	Channel Letters

PRINT & SIGNS

404-296-9141
www.printnsigns.com

2968 North Decatur Rd., Suite C,
Decatur, GA 30033
Fax: (404) 296-9164
E: Mail: pns2000@aol.com

**The Largest and Exclusive Appliances
Store in Southeast**

220V/110V Appliances · TV · VCR · CD Player · Toys · Cameras
Kitchen Appliances · Phones · Stereos · Fax Machines · Microwave Oven
Seiko-Citizen-Casio Watches · American Tourister · Samsonite Luggage
Brand Name Perfumes · Parker-Cross Pens · Rayban Sunglasses
Rice Pearls · Corals · Jade · Calculators · and many more Gift items.

A to Z

WE DO DIGITAL VIDEO CONVERSION

**ELECTRONICS
& GIFTS**

220V/110V APPLIANCES

Tel/Fax: (404) 299-9196

1713 Church St., Suite A-1, Decatur, GA 30033

Hours: Tue. To Sun. 11am-8pm | Monday Closed



PEOPLES

BANK & TRUST

MAIN OFFICE

1899 Buford Highway
Buford, GA 30518-6091

DOWNTOWN BRANCH

101 E. Main Street
Buford, GA 30518-5714

770-932-1900

www.peoplesbanktrust.com



FRIENDSHIP ROAD BRANCH

4977 Friendship Rd., Suite 113
Buford, GA 30518-1716

HARRIS BRANCH

2370 Buford Drive
Lawrenceville, GA 30043-2100

Mu Lau 華

Chin Chin

CHINESE & SUSHI

DINE IN • TAKE OUT

CATERING

3370 Lawrenceville-Suwanee Rd.
Suite 114
Suwanee, GA 30024
Tel: 770-831-3233

Voted Best Chinese Food
in Atlanta
10 Years In A Row

BAGA Committees: previous years

Year	President / Vice President	Secretary/Jt. Secretary	Treasurer
2008	Rabindra Chakraborty Papiya Dutta (VP)	Mousumi Karanjee	Shubu Mitra
2007	Dibyendu De Mrs. Shanta Gupta (VP) Mr. Achintya Dey (VP) Mr. Santanu Sinharoy (VP)	Dr. Ranjita Betarbet	Mr. Umashankar Mondal
2006	Kiriti Gupta Abir Mullick (VP) Anil Chakrabarti (VP)	Dibyendu De	Raktim Sen
2005	Mamata Paul Premanand Goswami (VP) Sabari Roy (VP)	Santanu Sinharoy	Soumen Ghosh
2004	Partho Mukherjee Mamata Paul (VP)	Moitri Sarker	Sandip Dutta
2003	Shankar Sengupta Amalendu Sarkar (VP)	Raja Gautam Kar	Sanghamitra Saha
2002	Raktim Sen Soumitra Chattopadhyay (VP)	Sabari Roy	Arunava Saha
2001	Amiya Ray Chaudhuri Mridul Kumar Paul (VP)	Amlan Mojumdar	Surajit Roy
2000	Debashis Bhattacharya (partial term served)	Working Committee: Sumitra Bhattacharya Shubhra Nag	Timir Pandit
1999	Nita Bose Shubhra Nag (VP) Maya Biswas (VP)	Ashoke Sarkar Madhumita Chatterjee Chaitali Chatterjee Anjali Roy	Sharmila Chatterjee Sathi Karan
1998	Sreeparna Roy Sanjukta Halder (VP)	Lekha Mukherjee Sabitri Pal	Rajashree Jena
1997	Shailendra Banerjee	Rajashree Jena Saibal Ghosal Gouri Banerjee	Timir Pandit
1996	Ashoke Bhattacharya	Sanjoy Maity	Joydip Bandyopadhyay
1995	Manoj Chakraborty		Ashoke Sarkar
1994	Monica Mukherjee	Anjali Roy	Alpana Poddar
1993	Shrimita Ray Chaudhuri	Sumitra Bhattacharya	Manoj Chakraborty
1992	Shubhra Nag	Kasturi Talukdar	Nirmal Das
1991	Kaberi Basu	Partha Bhattacharya	Gautam Goswami
1990	Sumitra Bhattacharya	Uma Mukherjee	Anik Chakraborty
1989	Dipak Bagchi	Dipankar Sarkar	Anita Chakraborty
1988	Niranjana Talukdar	Sujan Mukherjee	Anjan Duttagupta
1987	Alak Biswas	Shrimita Ray Chaudhuri	Dipak Bagchi
1986	Ashim Dutta	Monica Mukherjee	Barun De
1985	Ranjan Duttagupta	Bula Gupta	Soumya Das
1984	Partha Mukherjee	Rabi Basu	Lali Derrick
1983	Samarendra Mitra	Niranjana Talukdar	Samir Mitra
1982	Sabyasachi Gupta Alak Biswas (VP)	Ashim Roy	Priya Das
1981	Bijan Das	Samarendra Mitra	Partha Mukherjee Pranab Lahiri
1980	Mohit Sen Sumitra Bhattacharya (VP)	Jayanta Bhattacharya	Ashim Dutta
1979	Jayanta Bhattacharya	Partha Mukherjee	



ছবি -
শঙ্কর সেনগুপ্ত

